প্রাচীন ভারতে নারী

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৫৭

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
২.১

সূচিপত্র

আদর্শ ও অধিকার

নর ও নারী এই দুই লইয়াই মানব-সংসার। যতদিন মানুষের সৃষ্টি, ততদিন এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রুতি বলেন, আদিতে একমাত্র পরমপুরুষ ছিলেন একা। একা-একা তাঁহার ভালো লাগিল না—

স বৈ নৈব রেমে। বৃহদারণ্যক ১.৪.৩

তখন সেই প্রজাপতি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে পুরুষ ও নারীর উৎপত্তি হইল। সেই পুরুষ প্রকৃতিই আদি পতি ও পত্নী—

স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্॥ বৃহদারণ্যক ১.৪.৩

তাই শ্রুতি বলিলেন, এই যে জায়া তিনি নিজেরই অর্ধ ভাগ—

অর্ধো হ বা এষ আত্মনো যজ্ জায়েতি।

পুরুষ ও নারী একই পরমপুরুষের দুই ভাগ। এককে বাদ দিয়া অন্যে অসম্পূর্ণ। যে সমাজ নারীকে জ্ঞানহীন করিয়া শুধু পুরুষকেই শক্তিশালী করিতে চায় বা পুরুষকে পঙ্গু করিয়া শুধু নারীকেই প্রবল করিতে চায় তাহারা পরম-পুরুষের এক অর্ধেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তাঁহার অংশমাত্র লইয়া অগ্রসর হইতে চাহে। শাস্ত্রে আছে, রথের দুই চাকা, তাদের একটিকে বাদ দিয়া আর-একটিমাত্র চাকা লইয়া রথ চলিতে পারে না—

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।

মহাভারতের যুগেও নারীদের এই সম্মানের কথা দেখিতে পাই। মহাভারত (আদি ৭৪. ৪১) বলেন, মানুষের আধখানাই তার পত্নী। স্বামী ও স্ত্রী দুই যুক্ত না হইলে পরিপূর্ণ সাধনা হইবে কেমন করিয়া?

নরনারী উভয়ের প্রাণশক্তিতেই ভারতের সাধনা দিনে-দিনে অগ্রসর হইতেছিল। যেদিন হইতে নারীর সাধনাকে পঙ্গু করিয়া ভারতীয় সাধনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল সেইদিন হইতে ভারতের সাধনার ইতিহাস নানা শোচনীয় দুর্গতিতে ভরিয়া উঠিল।

ঋগ্বেদে দেখি নববধূকে আশীর্বাদ করিয়া ঋষি বলিতেছেন, শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর সকলেরই কাছে তুমি সম্রাজ্ঞী হও—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্ৰ্বাং ভব
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু। ঋগ্বেদ ১০.৮৫.৪৬

আপন সংসারের রানী হইয়া তুমি তোমার সংসারে প্রবেশ কর—

গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো। ঋগ্বেদ ১০.৮৫.২৬

এই সংসারকে পরিচালনা করিবার জন্য সদা সাবধানে জাগিয়া থাক—

অস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। ঋগ্বেদ ১০.৮৫.২৭

তাই ঘরে-ঘরে বধূকে 'সুমঙ্গলী' বলিয়া স্বাগত করা হইয়াছে। সকলের কাছে নববধূর সৌভাগ্য-আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হইয়াছে—

সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বি পরেতন। ঋগ্বেদ ১০.৮৫.৩৩

নববধূর প্রতি তাঁহাদের আশীর্বাদ ছিল, ইন্দ্রাণীর ন্যায় নিত্য শোভনবোধনে প্রবুদ্ধা হইয়া জ্যোতির্মুকুটভূষণা উষার সঙ্গে তুমি নিত্য প্রতিজাগরিতা থাকিও—

ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা
জ্যোতিরগ্রা উষসঃ প্রতি জাগরাসি। অথর্ব ১৪.২.৩১

বধূকে সম্রাজ্ঞী হইতে আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী হইবার উপায়ও বলা হইয়াছে। নদী তো অনেকই আছে, কিন্তু সিন্ধুই আপন দাক্ষিণ্য ও উদারতার গুণে সকলের প্রধান হইয়াছে; তুমিও পতিগৃহে গমন করিয়া আপন মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্য-গুণে সম্রাজ্ঞীর পদলাভ করিও—

যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা।
এবা ত্বং সম্রাজ্ঞ্যেধিপত্যুরস্তং পরেত্য। অথর্ব ১৪.১.৪৩

সকলের মধ্যে দাক্ষিণ্য ও কল্যাণ বিতরণ করিতে হইলে নারীকে পঙ্গু করিয়া রাখা চলিবে না।

এই তো হইল বৈদিক যুগের আদর্শের কথা। কথা হইল, সামাজিক ইতিহাসে আমরা এই আদর্শকে অনুসৃত দেখিতে পাই কি না। বৈদিক যুগের পরে ক্রমে নারীদের অধিকার অনেক বিষয়ে যে সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে তাহার কারণ সন্ততিলাভের জন্য বাধ্য হইয়া আর্যগণ শূদ্রকন্যাদের বিবাহ করিতেন। কন্যা কম ছিল বলিয়াই হউক, বা শীঘ্র শীঘ্র বংশবিস্তার করিবার জন্যই হউক, আর্যগণের মধ্যে শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করার প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত

হইল। তাই যেসব অধিকার আর্যকন্যাগণ পাইতেন সেইসব অধিকার পরে শূদ্রকন্যাদের হয়তো দেওয়া হইত না। ক্রমে এইসব কারণে ভারতে নারীদেরই অধিকার কমিয়া আসিতে লাগিল। এখন তো ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণের পত্নী হইয়াও শূদ্রারই সমতুল্যা। বেদাদিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। বলা বাহুল্য, পূর্বকালে এইসব শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্রেরা ব্রাহ্মণই হইতেন। তাহা প্রসঙ্গান্তরে দেখানো হইয়াছে।

মহাভারতের যুগেই নারীদের অনেক অধিকার সংকুচিত, নারীদের চরিত্রের বিরুদ্ধে বহু কথা আলোচিত দেখিতে পাই। তবু মহাভারতের ইতিহাসের মধ্যে নারীদের গৌরবেরও বহু সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে। জায়াকে মাতৃবৎ সম্মানার্হা মনে করিবে—

ভার্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ। আদি ৭৪.৪৮

স্ত্রীগণ যেখানে পূজিতা, সেখানে দেবতারা সুখী। যেখানে নারীগণ অপূজিতা সেখানে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল—

স্ত্রিয়ো যত্র চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
অপূজিতাশ্চ যত্রৈতাঃ সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ অনুশাসন ৪৬.৫.৬

নারীগণ পূজনীয়া, মহাভাগা, পুণ্যা ও সংসারের দীপ্তিস্বরূপা। তাঁহারাই সংসারের শ্রী, তাই যত্নপূর্বক তাঁহারা রক্ষণীয়া—

পূজনীয়া মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ো গৃহস্যোক্তাস্তস্মাদ্ রক্ষ্যা বিশেষতঃ॥ উদ্যোগ ৩৮. ১১

কেহ কেহ বলিবেন, নারীদের প্রতি এইসব কথা শুধু ভাবুকতা মাত্র। আসলে নারীরা দাসী মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, তাহা হইলে তাঁহারাই হইলেন দাসীপুত্র। সংস্কৃতে ইহার চেয়ে ঘৃণ্য গালি আর নাই। সংস্কৃত নাটকগুলিতে অতি ইতরজনের প্রতি ইতরজনোচিত চরম গালাগালি হইল 'দাস্যাঃ পুত্রঃ'। পত্নীভাবে দেখিলেও নারীদের বড় পরিচয় তাঁহাদের মাতৃত্বে। 'জায়া' কথার অর্থ পত্নী হইলেও তাহার মধ্যে মাতৃত্বই প্রধান কথা। যাঁহার মধ্যে নিজে জন্মগ্রহণ করা যায় তিনিই জায়া, অর্থাৎ মাতৃরূপই নারীদের যথার্থ স্বরূপ। নারীদের প্রতি ভদ্রব্যবহার করার কথা সংহিতাকারগণ সকলেই বলেন। অসংগত ভাষা বা অভদ্র ব্যবহারে পুরুষ যে নিন্দার্হ ও দণ্ডনীয় তাহা প্রায় সর্বসম্মত। এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ভদ্রতার শিক্ষা দিতে

হইবে, ইহাই ছিল রীতি। এই প্রসঙ্গে কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রের ধর্মস্থীয় তৃতীয় অধ্যায়ে উনষষ্টিতম প্রকরণে 'নগ্নে বিনগ্নে' ইত্যাদি বচন দর্শনীয়।[১]

অথর্ববেদে দেখা যায়, পূর্বকালে কন্যারাও ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পতিলাভ করিতেন—

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। অথর্ব ১১.৭.১৮

এখানে ভাষ্য বলেন, 'অকৃতবিবাহা স্ত্রী ব্রহ্মচর্যং চরতি'। শুক্ল যজুর্বেদও কন্যাদের শিক্ষা-দীক্ষা সমর্থন করেন। এমনকি স্মৃতির যুগেও এই প্রথার স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। দেবণ্ণ ভট্টের স্মৃতি-চন্দ্রিকায় বিবাহকালে নারীদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়—

বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ। সংস্কারকাণ্ড, স্ত্রীসংস্কার

মনুর মতে দেখা যায় যে, বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন—

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। ২.৬৭

ইহা উদ্‌ধৃত করিয়াও দেবণ্ণ ভট্ট হারীতের মত উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। হারীত (২১, ২৩) বলেন, নারীদের মধ্যে একদল ব্রহ্মবাদিনী, অন্যেরা সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীরা উপনয়ন, অগ্নীন্ধন, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা পালন করিবেন। সদ্যোবধূদের বিবাহকালে কথঞ্চিৎ উপনয়ন মাত্র করিয়া বিবাহ করিতে হইবে—

দ্বিবিধাস্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যসদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নম্ অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্যেতি। সদ্যোবধূনাং চোপস্থিতে বিবাহে কথংচিদ্ উপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্যঃ।—স্মৃতিচন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড, স্ত্রীসংস্কার

এই বিষয়ে কল্পান্তরাভিপ্রায় অর্থাৎ অন্যান্য স্মৃতির সমর্থন দিতে গিয়া তিনি যম হইতে উদ্‌ধৃত করেন, পুরাকালে নারীদেরও মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হইত। তাঁহাদের পক্ষে বেদের অধ্যাপন ও সাবিত্রীবচন বিহিত ছিল। তাঁহাদিগকে পিতা পিতৃব্য বা ভ্রাতা পড়াইতেন, অন্যেরা নহে। স্বগৃহেই তাঁহারা ভৈক্ষচর্যা করিতেন। তবে তাঁহারা অজিন চীর জটাধারণ বর্জন করিয়া চলিতেন—

১ গণপতি শাস্ত্রী, সংস্করণ ১৯২৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২০

পুরা কল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে।
বর্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেব চ।

—স্মৃতিচন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড Mysore, G. O. L. S. p 62

ঠিক এই বিধানই পরাশর-মাধবে দেখা যায়। সেখানেও যম ও হারীত হইতে এই ব্যবস্থা উদ্‌ধৃত করা হইয়াছে।[২]

সাধনার ক্ষেত্রে নারীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা পাইতেন। মহাভারতে দেখা যায়, কেহ কেহ নারীদের এই অধিকার পছন্দ করেন নাই। কুনির্গর্গ নামে এক মহাবীর্য ঋষি ছিলেন (শল্য ৫২. ৩), তাঁহার কন্যা কঠোর তপস্যা করিয়াও পরমা গতি লাভ করিতে পারেন নাই। নারদ বলিলেন, হে অনঘে, তোমার বিবাহসংস্কার হয় নাই, তখন কেমন করিয়া পরমলোক লাভ হইবে?—

অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে। শল্য ৫২.১০

তখন কন্যা বিবাহার্থিনী হইয়া তাঁহার তপস্যার অর্ধফল দিয়াও যে-কোনো বরকে প্রার্থনা করায় মুনি গালবি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া একরাত্রি মাত্র তাহার সঙ্গে বাস করেন (শল্য ৫২.১৩-২২)। ৫২তম অধ্যায়ে এই কথা। অথচ মহাভারতে সেই পর্বের ৫৪তম অধ্যায়েই সাধ্বী কৌমারব্রহ্মচারিণী তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ধৃতব্রতা শাণ্ডিল্যসুতার বহু প্রশংসা আছে—

অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী
বভূব শ্রীমতী রাজন্ শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী॥ শল্য ৫৪.৫-৭

স্ত্রীলোক হইলেও তিনি ঘোর তপস্যা করিয়া স্বর্গে গেলেন এবং মহাভাগা সেই নারী দেবব্রাহ্মণ-পূজিতা হইয়া রহিলেন—

সা তু তপ্ত্বা তপো ঘোরং দুশ্চরং স্ত্রীজনেন হ।
গতা স্বর্গং মহাভাগা দেবব্রাহ্মণপূজিতা॥ শল্য ৫৪.৭-৮

২ পরাশর-মাধব, আচারকাণ্ড. দ্বিতীয় অধ্যায়, *Bibliotheca Indica.* *A. S. B.* চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ ৪৮৫

আবার অনুশাসনপর্বে অষ্টাবক্র মুনি উত্তরদেশে গিয়া তপস্বিনী মহাভাগা দীক্ষাধর্মপালনে রতা এক বৃদ্ধা নারীকে দেখিলেন—

তপস্বিনীং মহাভাগাং বৃদ্ধাং দীক্ষামনুষ্ঠিতাম্। অনুশাসন ১৯.২৪

পরে এই কন্যাকে অষ্টাবক্র বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ যত তপস্যাই থাকুক না কেন নারীদের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। বিবাহ নারীর অবশ্য ধর্ম।

শান্তিপর্বে (৩২০. ৭) 'সুলভানাম ভিক্ষুকী'র কথা আছে। সেইখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, স্ত্রীলোকদেরও বিবাহের পূর্বে বা বৈধব্যের পরে সন্ন্যাসে অধিকার আছে। তখন তাঁহারা ভিক্ষাচর্য, মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণ, একান্তে আত্মধ্যান, ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিবেন—

স্ত্রীণামপি প্রাগ্‌বিবাহাদ্ বৈধব্যাদূর্ধ্বং বা সন্ন্যাসে অধিকারোঽস্তি ইতি দর্শিতম। তেন ভিক্ষাচর্যং মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণম্ একান্তে আত্মধ্যানঞ্চ তাভিরপি কর্তব্যম্, ত্রিদণ্ডাদিকঞ্চ ধার্যম্।

এই সুলভার সঙ্গে রাজর্ষি ব্রহ্মবিত্তম জনকের গভীর যোগশাস্ত্রের কথা হয়।

রামায়ণেও (আরণ্য ৭৪. ৩১) সিদ্ধা ধর্মসংস্থিতা শবরীর কথা আছে। তাঁহার রম্য আশ্রমে রাম গিয়াছিলেন (ঐ ৭৪. ৪-৫)। সেই সিদ্ধা সিদ্ধসম্মতা বৃদ্ধা শবরী (ঐ ৭৪. ১০) রামকে স্বাগত করেন। সাধ্বী শংসিতব্রতা (ঐ ৭৪. ৩১) জটাযুক্তা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা শবরী (ঐ ৭৪. ৩২) জ্বলন্তপাবকসংকাশা হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন (ঐ ৭৪. ৩৩.)।

শ্রুতিতে ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখা যায়, পত্নীরা কটিতে মেখলা ধারণ করিতেন। তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য বিহিত ছিল।[৩] কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে বৈদিককর্মে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের (অধিকারী-নিরূপণ, ১, ৬) বলিয়াই বলা হইয়াছে—ঠিক এইরূপই নারীরও অধিকার, তাহাতে কোনো বিশেষ নাই —

স্ত্রী চাবিশেষাৎ। ঐ ১.৭

আচার্য কর্ক তাঁহার ভাষ্যে কথাটা আরও ভালো করিয়া বলিয়াছেন; পরবর্তী সূত্রে কাত্যায়ন বলেন, নারীদের এই অধিকার সর্বত্র দেখা যায়—

দর্শনাচ্চ। ঐ ১.৮

ভাষ্যকার কর্ক এখানে বলেন, যজমানকে মেখলার দ্বারা দীক্ষা দেওয়া হয়,

৩ স্মৃতি-চন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড, স্ত্রীসংস্কার

যোক্তে্র দ্বারা পত্নীকে। পুরুষের সঙ্গেই তাঁহার অধিকার, পৃথক নয়। একই কাজে যেমন যজমানসাধ্য কৃত্য আছে তেমনি পত্নীসাধ্য কৃত্যও আছে।

হারীতও যে নারীদের ব্রহ্মচর্য ও উপনয়নের অধিকার সমর্থন করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় তাঁহার 'প্রাগ্ রজসঃ সমাবর্তনম্' কথাতে। বৃহদ্দেবতাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭২-৮১ শ্লোকগুলিতে ব্রহ্মবাদিনী 'বাক্'এর কথাই বর্ণিত। ৮২, ৮৩ ও ৮৪ শ্লোকে বেদের কয়েকটি নারী-ঋষির কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষৎ, নিষৎ, জুহূনাম্নী ব্রহ্মজায়া, অগস্ত্যের ভগ্নী অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদীসকল, যমী, নারী শশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, সূর্যা ও সাবিত্রী। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া বিঘোষিত—

ঘোষা গোধা বিশ্ববারা অপালোপনিষন্নিষৎ।
ব্রহ্মজায়া জুহূর্নাম অগস্ত্যস্য স্বসাদিতিঃ। ২. ৮২
ইন্দ্রাণী চেন্দ্রমাতা চ সরমা রোমশোর্বশী।
লোপমুদ্রাচ নদ্যশ্চ যমী নারী চ শশ্বতী। ২. ৮৩
শ্রীর্লাক্ষা সার্পরাজ্ঞী বাক্ শ্রদ্ধা মেধা চ দক্ষিণা।
রাত্রী সূর্যা চ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ। ২. ৮৪

বৃহদ্দেবতা ইঁহাদিগকে 'ব্রহ্মবাদিনী' বলিয়াই ঘোষিত করিলেন, সমাজেও তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী নামেই প্রখ্যাত ছিলেন। কাজেই নারীদের ব্রহ্মবাদিনী হওয়ার অধিকার তখনও ছিল।

গোভিল-গৃহ্যসূত্রে (২.১. ১৯) একটি মন্ত্রে আছে— প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্। সেখানে ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন, নারীদের যজ্ঞসূত্রধারণ প্রচলিত ছিল। হারীতও যে ইহা বৈধ বলিয়াছেন তাহা বুঝা যায় তাঁহার 'প্রাগ্‌রজসঃ সমাবর্তনম্' এই কথায়।

আপস্তম্ব নারীদের শিক্ষা সমর্থন করিয়াছেন।[৪]

দুহিতাকে পণ্ডিতা করিবার ইচ্ছা থাকিলে (য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত) কি করিতে হইবে তাহারও বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৬.৪.১৭) ব্যবস্থা দিয়াছেন। এখানে মূলের উদারতাটুকু শাঙ্কর-ভাষ্যে দেখা যায় না। বৌধায়নেও (গৃহ্যসূত্র ৩.৪) এইরূপ উদারতার অভাব দেখা যায়। মীমাংসকদের মধ্যে

৪ যজ্ঞপরিভাষা, দ্বিতীয় সূত্র, ভাষ্য

প্রভাকর যে দ্বিজনারীর বেদপাঠ সমর্থন করিয়াছেন তাহা মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা দেখাইয়াছেন।[৫]

মহাভারত (অনু ৪০. ১২) নারীদের কোথাও কোথাও 'অশাস্ত্রা' বলিলেও বহুস্থলে নারীদের শিক্ষাদীক্ষার কথা বলিয়াছেন। স্মৃতির যুগে, মনুর সময়ে নারীদের শিক্ষার অধিকার অনেকটা সংকুচিত দেখা যায়। মনু (৯. ১৮) বলিয়াছেন, নারীদের আবার বেদমন্ত্র দিয়া কী হইবে—

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈঃ .

বৈবাহিক বিধিই তাঁহাদের বৈদিক সংস্কার (২. ৬৭)। যজ্ঞে নারীরা চালক হইতে পারেন না (৪. ২০৫.৬)। নারীরা যজ্ঞে আহুতি দিলে বা নারীদের দ্বারা যজ্ঞে আহুতি দেওয়াইলে নরকে পতিত হইতে হয় (১১. ৩৭)। কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত, মনু (২. ২১৩-১৫) বহুস্থলে নারীদের চরিত্রকেও বিষম আক্রমণ করিয়াছেন। স্ত্রীদিগকে শারীর দণ্ড দিবার ব্যবস্থাও মনু দিয়াছেন (৮. ২৯৯-৩০০)। অথচ নারীদের প্রতি ভালো ব্যবহার ও নারীদের মহত্ত্বের কথাও মনুতে বহু স্থানে আছে।

বেদের মন্ত্রে কেহ কেহ নারীদের অধিকার অস্বীকার করিলেও মনে রাখিতে হইবে বহু বেদমন্ত্র নারীদেরই রচিত। বৃহদ্দেবতায় উক্ত তালিকা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে, ঋগ্বেদেও দেখা যায় বহু নারী মন্ত্ররচনা করিয়াছেন। রোমশা (১. ১২৬), লোপামুদ্রা (১. ১৭৯), বিশ্ববারা (৫. ২৮), অপালা (৮. ৯১.৭), যমী (১০. ১০), বসুক্রজায়া (১০. ২৭-২৮), ঘোষা (১০. ৩৯), সূর্যা (১০. ৮৫), উর্বশী (১০. ৯৫), সরমা (১০. ১০৮), বাক্ (১০. ১২৫), ইন্দ্রাণী (১০. ১৪৫), ইন্দ্রজননী (১০. ১৫৩), বিবস্বৎকন্যা যমী (১০.১৫৪) শচী (১০. ১৫৯), সার্পরাজ্ঞী (১০. ১৮৯) ছাড়া আরও বহু নাম ঋগ্বেদ-সংহিতায় ও অন্যান্য বেদে পাওয়া যায়।

উপনিষদেও মৈত্রেয়ী, গার্গী-বাচক্নবী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়। পতঞ্চল কাপ্যের কন্যা গন্ধর্বগৃহীতা (বৃহদারণ্যক ৩.৩.১) ও উমা হৈমবতীর (কেন ২৫) কথা বলিয়া লাভ নাই। কারণ তাঁহারা সাধারণ বিধির বাহিরে। ব্রহ্মবাদিনী নারীরা বড় বড় সংসদে ও বিদ্বজ্জনের সভাতে যে যোগ দিতেন সে কথা নানা উপনিষদেই আছে।

---

৫ *Prabhakar School and Popular Mimamsa*

গোভিল-গৃহ্যসূত্রে (২. ১. ১৯-২০) এবং কাঠক গৃহ্যে নারীদের বেদমন্ত্রে অধিকারের কথা দেখা যায়। নারীরা যে শিক্ষাও দিতেন তাহা বুঝা যায় পাণিনির 'আচার্যা' এবং 'উপাধ্যায়া' ও 'উপাধ্যায়ী' (৩. ৩. ২১) শব্দগুলিতে। এখানে কাশিকাবৃত্তি কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কাশকৃৎস্নি ছিলেন একজন মীমাংসাচার্য। তাঁহার মীমাংসার নাম কাশকৃৎস্নী (৪. ১. ৪)। সেই মীমাংসায় ব্যুৎপন্না নারীকে বলে 'কাশকৃৎস্না' (৪. ১. ১৪)। প্রাচীন ব্যাকরণ আপিশল যে নারী শিখিয়াছেন, তিনি 'আপিশলা' (৪. ১. ১৪)। পতঞ্জলি ইহাদের পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে আরও জানিতে পারি যে, অনেক সময় নারীরা নারীগুরুর কাছেই শিক্ষা করিতেন (৪-১.৭৮)। পুরুষদের কাছে পুরুষছাত্রদের সঙ্গেও যে নারীরা অধ্যয়ন করিতেন তাহার কথা আমরা খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লেখক ভবভূতির উত্তররামচরিতে পাই। ভগবান বাল্মীকি যখন লবকুশকে ত্রয়ীবিদ্যা শিখাইতেন তখন নারী আত্রেয়ী সেই সঙ্গে পড়িতেন, তবে মনস্বী লবকুশের শিক্ষার গতিবেগের সঙ্গে তিনি তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না (দ্বিতীয় অঙ্ক)। মালতীমাধবেও ভবভূতি দেখাইয়াছেন, নরনারী একত্র আচার্যকুলে পড়িতে পারিতেন। কামন্দকী সেখানে পড়িয়াছেন। ইহার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরীতে দেখাইয়াছেন মহাশ্বেতার রূপখানি। ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা মহাশ্বেতার কায়া ছিল পবিত্রীকৃত—

ব্রহ্মসূত্রেণ পবিত্রীকৃতকায়াম্। কাদম্বরী নির্ণয়সাগর, ১৯১২, পৃ ৪৮২

যাঁহারা দেবীদের পুরাতন মূর্তি দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বহু দেবীরই উপবীত আছে। দেবীর ধ্যানেও 'নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্' প্রভৃতি কথা মেলে। মহাভারতে নারীদের বেদপাঠের রীতিমতই উল্লেখ আছে। শিবা নামে বেদপারগা সিদ্ধা ব্রাহ্মণী সর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়া অক্ষয় দেহ লাভ করেন—

অত্র সিদ্ধা শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা।
অধীত্য সাখিলান্ বেদান্ লেভে স্বং দেহমক্ষয়ম্। উদ্যোগ, ১০৯.১৯

ভারতবর্ষ সব সত্যের মূলে দেখিয়াছে ব্রহ্মকে। কাজেই তাঁহাদের মতে নরনারীর পার্থক্য কেন হইবে। শ্বেতাশ্বতর বলেন, তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি। ঐ, ৪.৩

স্ত্রী পুরুষ বলিয়া তবে কেন ভেদ হইবে? একই আত্মা যখন যে শরীরে

যুক্ত হয় তখন তার সেই রূপ। এই পরিচয় তো বাহ্যমাত্র, আসলে সর্বত্রই আত্মা তো এক—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেব ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে। শ্বেতাশ্বতর ৫. ১০

জৈন ও বৌদ্ধ সাধনাতেও বহু নারী তপস্যায় উচ্চতম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন থেরীগাথা গ্রন্থে এইরূপ বহু বৌদ্ধ তপস্বিনীর পরিচয় আছে।

সংসারাশ্রমেও পত্নীর অধিকার কম ছিল না। যজ্ঞে ও সামাজিক ধর্মাচরণে পত্নীর পূর্ণ অধিকার ছিল।[৬] 'জায়া' কথাতে ততটা অধিকার সূচিত হয় না। জায়াশব্দে তিনি পুত্রের জননী মাত্র। 'পত্নী' কথাতে বুঝা যায়, নারীদেরও অধিকার ও নেতৃত্ব আছে। তবে অনেকস্থলে পত্নীকে জায়া বলিয়া প্রকরণবিশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের (১. ১. ৪. ১৩) জায়াকে মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৪. ৮. ১) বলিলেন 'পত্নী', মনু বলিলেন, 'স্ত্রী'। পূর্বে যেখানে জায়াই আহুতি দিতে পারিতেন সেখানে পরে সেই আহুতি দিতেন পুরোহিতেরা।[৭] অর্থাৎ জায়ার এই অধিকারটুকু ক্রমশ সংকুচিত হইল।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে দেখা যায়, মন্ত্রপাঠে হোমে আহুতিতে স্ত্রী সমানভাবে যোগ দিতে পারিতেন, সামগানের সময়ে ধুয়াও ধরিতে পারিতেন। পরে এরূপ তর্কও উঠিল, যেহেতু স্ত্রীর নিজস্ব অর্থ নাই তাই তাঁহার যজ্ঞ অসম্ভব। জৈমিনি এইরূপ তর্ক তুলিয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন যে, অর্থে স্বামীর ও স্ত্রীর অধিকার সমবেত, 'অর্থেন চ সমবেতত্বাৎ'[৮] ; কাজেই সেখানে ভাষ্যকার মাধবও বলেন, নারীদেরও ধর্মকর্মের অধিকার আছে, 'অস্তি স্ত্রিয়াঃ কর্মাধিকারঃ'। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর ও স্ত্রীর একই অধিকার এবং একত্র অধিকার[৯] আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞপত্নীর কর্তব্যের কথা পাওয়া যায়। তাহার আদি— 'বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েদ্ হোতা অধ্বর্যুর্বা বেদোঽসি বিত্তিরসি' ইত্যাদি

৬ শতপথ ব্রাহ্মণ ১, ৯, ২, ১৪ ; পাণিনি, ৪, ১, ৩৩

৭ ঋগ্বেদ ১.১২২.২ ; ৩.৫৩.৪-৬ ; ৮.৩১.৫ ; ১০.৮৬.১০ ইত্যাদি ; শতপথ ব্রাহ্মণ ১. ১. ৪, ১৩

৮ জৈমিনি ন্যায়মালা ৬.১.৩.১৪ ৯ জৈমিনি ন্যায়মালা ৬.১.৩.১৬-১৭

(১.১১)। মহাভারতে অনেক স্থলে নারীদের এই অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। স্বামীর সেবা ছাড়া যাগযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ-উপবাস নারীদের নাই।[১০] অথচ কুন্তী বলিতেছেন, আমি যথাবিধি সোমপান করিয়াছি।[১১] তাহাতেই মনে হয়, যজ্ঞে সোমের অধিকার তখনও নারীদের ছিল। রামায়ণেও দেখা যায়, কৌশল্যা ছিলেন দশরথের যজ্ঞাংশভাগিনী। মহাভারতে (অশ্ব ৮৯. ২) দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা বিধিবৎ রাজসূয়যজ্ঞে অশ্ব সমানয়ন করিয়া দ্রুপদাত্মজাকে সেখানে যজ্ঞকর্মের জন্য বসাইলেন। মহাভারত এই কথাও বলেন, ধর্ম দারারই অধীন।[১২] রামায়ণে (সুন্দর ১৪. ৪৯) দেখা যায়, জানকী নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য নদীর তীরে আসিতেন। এখানে টীকাকার রামায়ণতিলকে তর্ক তুলিতেছেন যে, নারী তো বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন না, তবে বাকি কাজ করিতে পারেন। মূলে কিন্তু এইসব আপত্তি দেখা যায় না। বরং ইহার পূর্বেই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (২৪. ৩৮) তারা বেদ ও শাস্ত্রপ্রমাণে সিদ্ধ করিতেছেন যে, স্বামী ও স্ত্রী অভিন্ন। বালিপত্নী তারা তো মাত্র কপিকুলসম্ভবা। সীতাদেবীর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা। তবু টীকাকার উৎসাহবশে নারীদের বেদাচার অপ্রমাণ করিতে চাহেন, এমনকি সীতাদেবীর কথাপ্রসঙ্গেও। পরমপাবনী নারায়ণী সীতাদেবীকেও এইসব টীকাকারেরা ছোট না করিয়া ছাড়িতে চাহেন নাই। সাধারণ নারীরা আর তাঁহাদের কাছে কতটুকু আশা করিতে পারে ?

প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা শুদ্ধ যাগযজ্ঞে নহে লোকশিক্ষার্থ নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়েও স্ত্রীদের সঙ্গে লইতেন (মহাভারত, অনু, ৯৩, ২১) মহাভারতের যুগে সভাতেও নারীদের স্থান প্রস্তুত রাখিতে হইত (আদি, ১৩৪, ১১)। কখনও কখনও পরামর্শ দিবার জন্য নারীরা সভাতে আহূতা হইতেন। গান্ধারীকে এইরূপ সভাতে মন্ত্রার্থ আহ্বান করা হইয়াছিল (উদ্যোগ, ৬৭-৬)। দেবী গান্ধারী ছিলেন মহাপ্রজ্ঞা বুদ্ধিমতী 'আগমাপায়তত্ত্বজ্ঞা' (আশ্রম, ২৮,৫)। ধর্মপ্রাণা গান্ধারীর আপন পর বলিয়া কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। সত্যধর্ম

১০ অনুশাসন, ৪৬. ১৩ ; ৫৯, ২৯

১১ পীতঃ সোমো যথাবিধি। আশ্রমবাসিক, ১৭. ১৭

১২ দারেম্বধীনো ধর্মশ্চ। অশ্বমেধ, ৯০. ৪৮

রক্ষার্থ নিজের পুত্র পাপী দুর্যোধনকে তিনি ত্যাগ করিবার জন্য বারবার ধৃতরাষ্ট্রকে ধরিয়াছেন—

তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ। সভা, ৭৫ ৮

গান্ধারীর জা' কুন্তীও বৈদিকমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন (বন ৩০৪-২০)। তপস্বিনী শাণ্ডিলী ছিলেন মনস্বিনী সর্বজ্ঞা সর্বতত্ত্বজ্ঞা (অনু ১২৩-২)। এক পতিব্রতা নারী সাঙ্গোপনিষৎ অধীতবেদ তপস্বী কৌশিককে সুন্দর ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন (বন ২০৫. ৩৩-৩৮)। তপোবৃদ্ধা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সমানশীলা ও সমানব্রতচারিণী ছিলেন (অনু ১৩০. ২); তাঁহার কাছে পিতৃগণ ও ঋষিগণ ধর্মের গুহ্যতম তত্ত্ব শুনিতে চাহিলেন এবং শুনিয়া ধন্য হইলেন (ঐ ১৩০ অধ্যায়)। তপস্বিনী সুলভার কাছে সর্ববেদবিৎ ব্রহ্মবাদী জনক যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন তাহা শান্তিপর্বের ৩২০তম অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সেই-সব কথা যোগতত্ত্বের সার। জনক তাঁহার স্বাগতার্থ পাদশৌচ করাইয়াছিলেন (৩২০. ১৪)। অনুশাসনপর্বের আরম্ভেই (১-১৭) স্থবিরা শমসংযুতা তাপসী গৌতমীর কথা দেখা যায়। অশ্বমেধপর্বের ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণসংবাদে (২০-২৫ অধ্যায়) পতিশিষ্যা ব্রাহ্মণীর কথা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

নারীগণ জ্ঞানে ধর্মে ও তপস্যায় অধিকারিণী ছিলেন বলিয়া যে সংসারের কাজে তাঁহারা মনোযোগ দিতেন না তাহাও নয়। দ্রৌপদী ধর্মজ্ঞা ও ধর্মদর্শিনী ছিলেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৪-৪)। নীতিশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

২

মধ্যযুগের সাধক-সন্তদের মধ্যেও অনেক নারী ছিলেন। ক্ষেমা পদ্মাবতী দাদূর কন্যা নানীবাঈ ও মাতাবাঈ সাধনার রাজ্যে প্রখ্যাত। ভক্তিমতী করমা ও মীরাবাঈর কথা তো সর্বজনবিদিত। প্রেমের ও ভক্তির গানে মীরার সমতুল্য কেহ নাই। তারপর প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বেকার সহজোবাঈ, দয়াবাঈ প্রভৃতি নারী আছেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে যোধপুরে তপস্বিনী অজনেশ্বরী, বীকানীরে গৌরাঁজী, জনাবাঈ, মহারাষ্ট্রদেশে কৃষ্ণানদীতটনিবাসিনী সখূবাঈ, পাণ্টরপুরের কানূহু পাত্রা, পুনাতে বাবাজান, মহিশূরে শান্তিবাঈ, মধ্যপ্রদেশে মায়াবাঈ, নামদেবের পরিচারিকা প্রভৃতি ছিলেন। কয়েক

শতাব্দী পূর্বে স্থফী সাধিকা বাউরী সাহিবা দিল্লীপ্রদেশে এক সাধকের ধারা প্রবর্তন করেন। বাল্যকালে আমরা কাশীতে বরুণাসঙ্গমে তপস্বিনী মাতাজীকে দেখিয়াছি। রাধাস্বামী সম্প্রদায়ে মহারাজসাহেব পণ্ডিত ব্রহ্মাশঙ্কর মিশ্রের ভগ্নী মাহেশ্বরী দেবীকে সকলে তপস্বিনী মহারানী বুআজী (পিসিমা) বলিতেন। তিনি কাশীর কন্যা, কাজেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের দেখা-শোনা ছিল। পরমহংসদেবের স্ত্রী সারদেশ্বরী দেবী বহু লোককে সাধনা দিয়াছেন। ভারতের বাহিরেও বহু নারী ভক্ত আছেন, তাঁহাদের নাম আর করিলাম না। কাজেই দেখা যাইতেছে, ভারতে চিরদিনই নারীদের প্রতি সর্বসাধারণের চিত্তে একটি শ্রদ্ধার ভাব চলিয়া আসিতেছে। যদি কোনো ব্যবস্থাপক ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াও থাকেন, তবু সাধারণের মধ্যে নারীমাহাত্ম্যের গৌরব তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেই মহাভারতের যুগেও দেখি পরিবারে নারীর বিলক্ষণ সম্মান ছিল (বিরাট ৩-১৭)। তাই যদিও আদিপর্বে (১৫৯-১১) একবার দুহিতাকে 'কৃচ্ছ্র' বলা হইয়াছে তবু পুত্রের চেয়ে কন্যাকে কেহ কম করিয়া দেখেন নাই। ভীষ্ম বলেন, পুত্র তো নিজেরই স্বরূপ, কন্যাও পুত্রেরই সমতুল্য, এই আত্মস্বরূপ ইঁহারা থাকিতে কেন ধন অন্যে পাইবে—

> যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
> তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥ অনুশাসন ৪৫-১১

কন্যারা যে রীতিমতই উত্তরাধিকারিণী সে কথা ভীষ্ম স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গেলেন যে, কন্যা থাকিতে অন্যের কোনো অধিকারই নাই।

তাই পুত্রের মত কন্যাদেরও রীতিমত জাতকর্মাদি মহাভারতের যুগে অনুষ্ঠিত হইত (আদি ১৩০-১৮)। সাবিত্রীর জন্মের পরেও জাতিক্রিয়াদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (বন ২৯২-২৩)। ভার্যারূপেও নারীরা সেই যুগে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন—

> অর্ধং ভার্যা মনুষ্যস্য ভার্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
> ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥ আদি ৭৪-৪১

ইহার পরও ৪২-৪৭ শ্লোকে এবং ৫১ শ্লোকে ভার্যারই মাহাত্ম্য কীর্তিত। অনুশাসনপর্বে নারীদের স্বাধীনতা সংকোচের কথা বলিয়াও নারীদের যে সৎকার করিতে হইবে ও সর্বক্ষেত্রে তাঁহারাই যে শ্রী, এই কথা বলিতে

মহাভারত বাধ্য হইয়াছেন (৪৬-১৫)। শান্তিপর্বের ১৪৪তম অধ্যায়টি আগাগোড়াই ভার্যা-প্রশংসা।

রামায়ণেও দারাকে আত্মা বলা হইয়াছে (অযোধ্যা ৩৭-২৪)। অর্থাৎ, পত্নীকে পতি অপরজ্ঞানে হীনদৃষ্টিতে বা নীচভাবে দেখিতে পারিবেন না।

মহাভারতের যুগে নারীদের অধিকারের বিরুদ্ধে মুখে কেহ-কেহ কিছু বলিলেও সামাজিক জীবনে নারীদের অনেক অধিকারই দেখা যায়। রাজকন্যাদের তখন প্রায়ই স্বয়ংবরপ্রথায় বিবাহ হইত। সাবিত্রী দময়ন্তী কুন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি অনেকের বিবাহে কন্যারা নিজেরাই বর বরণ করিয়াছেন। এই স্বয়ংবরপ্রথায় নারীর অধিকার কিরূপ ছিল তাহা জানিতে হইলে বনপর্বের ২৯২-তম অধ্যায়ে সাবিত্রীর প্রতি তাঁহার পিতার প্রদত্ত উপদেশগুলি দেখা উচিত (৩২-৩৬ শ্লোক)। যম ও সাবিত্রীর মধ্যে যে কথাবার্তা তাহাও (বনপর্বের ২৯৬তম অধ্যায়) পড়া উচিত।

স্বয়ংবরপ্রথাতেই বুঝা যায়, তখন যুবতীবিবাহই সমধিক চলিত ছিল। বালিকাবিবাহ যে ছিল না তাহা নহে, তবে যুবতীবিবাহই তখন বেশি প্রচলিত ছিল। তখনকার বৈদিক মন্ত্রাদিতেও ইহাই বুঝা যায়। মনু তো নারীদের বিষয়ে খুবই সাবধানে বিধান দিয়াছেন। তবু তিনি অপাত্রকে কন্যাদানের চেয়ে ঋতুমতী কন্যা যাবজ্জীবন ঘরে থাকাও ভালো বলিয়াছেন (৯. ৮৯)। এখানে টীকাকার মেধাতিথি বলিয়াছেন, ঋতুর পূর্বে কন্যাকে দান করিবে না, যাবৎ গুণবান বর না মেলে—

প্রাগ্‌ঋতোঃ কন্যায়া ন দানম্‌···
যাবদ্‌ গুণবান্‌ বরো ন প্রাপ্তঃ

যুবতীদের বিবাহে যে অনেকসময় জাতিভেদ প্রভৃতির অনুশাসন পালিত হইতে পারিত না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমার 'জাতিভেদ' পুস্তকে এই বিষয়ে আমি বহু আলোচনা করিয়াছি। বৌদ্ধদের মধ্যে তো জাতিভেদের এত মানামানিই ছিল না। কোশলপতি পসেনদি দাসীকন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করেন। বণিককন্যা দেবীর গর্ভেই অশোকের পুত্র মহিন্দ ও সংঘমিত্তার জন্ম। শিকারীদের রাজকন্যার সহিত সাধু উপদের বিবাহ হয়। সর্দারপুত্র শার্দূলকর্ণের সহিত ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ ঘটিয়াছিল।

আবার মাঝে মাঝে আভিজাত্যগর্বিত রাজকুলে ভাইবোনেও যে বিবাহ

হইত বৌদ্ধদের কথায় তাহা দেখা যায়। রাজা ওক্কাকের চারিপুত্র। তাঁহাদের সমান অভিজাতকন্যা কোথাও আর মিলিল না বলিয়া চারি ভাই চারিটি বোনকে বিবাহ করেন। লাঢ়রাজ সিংহবাহুও ভগ্নীকে বিবাহ করেন। অজাতশত্রুর স্ত্রী বজ্রিরা ছিলেন তাঁহার মামাতো বোন। আনন্দের স্ত্রী উৎপলবর্ণা ছিলেন তাঁহার পিসতুত বোন। মগধের এক গৃহপতি আপন মামাতো বোন সুজাতাকে বিবাহ করেন। পুণ্ডকাভর-পত্নী সুবন্নপালী ছিলেন তাঁহার মামাতো বোন। লঙ্কার রাজকন্যা চিত্তার বিবাহ হয় তাঁহার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। বেদে যম-যমী ছিলেন ভাইবোন। কুন্তীও ছিলেন বসুদেবের ভগ্নী (বসুদেবস্য ভগিনী, মহাভারত, বন ৩০২-২৪)—

স্বসারং বসুদেবস্য শত্রুসঙ্ঘবিমর্দিনঃ।
কুন্তিরাজসুতাং কুন্তীং সর্বলক্ষণপূজিতাম্। আদি ১৫১-২৪

কাজেই বসুদেব হইলেন অর্জুনের মামা (সহিতো বাসুদেবেন মাতুলেন, অশ্ব ৮৩-১৬)। সেই মাতুলের কন্যা সুভদ্রাকে দেখিয়াই অর্জুন কন্দর্পাহত হইলেন—

দৃষ্টৈব তাম্ অর্জুনস্য কন্দর্পঃ সমজায়ত। আদি ২১৯-১৫

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অবস্থা দেখিয়া সুভদ্রার পরিচয় দিয়া বলিলেন, যদি তুমি ইহাকে চাও তবে আমি পিতাকে বলি—

যদি তে বর্ততে বুদ্ধির্বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়ম্। আদি ২১৯-১৭

অর্জুন বলিলেন, যদি তোমার এই ভগ্নী আমার মহিষী হন তবে আমার পরম উপকার করা হয়—

কৃতমেব তু কল্যাণং সর্বং মম ভবেদ্ ধ্রুবম্।
যদি স্যান্ মম বার্ষ্ণেয়ী মহিষীয়ং স্বসা তব। আদি ২১৯-১৯

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তবে স্বয়ম্বরে কাজ নাই, কারণ তাহাতে ফল সংশয়িত। বরং তুমি ইহাকে হরণ কর; ক্ষত্রিয়দের তাহাতে দোষ নাই (আদি ২১৯, ২১-২৩)। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সব কথা জানানো হইলে তিনিও ইহা সমর্থন করিলেন—

শ্রুত্বৈব চ মহাবাহুরনুজজ্ঞে স পাণ্ডবঃ। আদি ২১৯-২৫

এই মামাতো বোন সুভদ্রার গর্ভেই বীরকুলশিরোমণি অভিমন্যুর জন্ম।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। তাঁহার কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। এই কন্যাকে পূর্বে চেদিপতি শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ দিবার

কথা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী আপনার ভগ্নীর এই হরণকে পছন্দ করেন নাই। মহাভারতে আছে—

নাঽমৃষ্যত পুরা যোঽসৌ স্ববাহুবলগর্বিতঃ।
রুক্মিণ্যা হরণং বীরো বাসুদেবেন ধীমতা॥ উদ্যোগ ১৫৭-১১

হয়তো শ্রীকৃষ্ণের এই মামাতো বোনকে হরণ করিয়া বিবাহ করা রুক্মী সঙ্গত মনে করে নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই বিবাহ পরবর্তীকালের কোনো কোনো ধর্মনেতাও পছন্দ করেন নাই। তাই তর্কস্থলে সেইসব পণ্ডিতেরা যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, রুক্মিণী ভীষ্মকের ঔরসজাতা না হইতেও পারেন। তাঁহাদের এইরূপ তর্ক পূর্বমীমাংসা-গ্রন্থে আরও আছে। ভীষ্ম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অথচ স্ত্রী-বিনা যজ্ঞ হয় না। তাই তাঁহাদের বলিতে হইল, মহাভারতে লেখা না থাকিলেও ভীষ্ম নিশ্চয় বিবাহ করিয়াছিলেন, নহিলে স্ত্রী-বিনা যজ্ঞ করিবেন কেমন করিয়া? মহাভারতে তো স্পষ্টই দেখি ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী (পুত্রো রুক্মীতি বিশ্রুতঃ। উদ্যোগ ১৫৭,১-২)। মহাভারত আদিপর্বে আছে রুক্মিণী হইলেন শ্রীর অংশাবতার। তিনি পৃথিবীতে ভীষ্মকের কুলে জন্ম নিলেন—

শ্রিয়স্তুভাগঃ সংজজ্ঞে রত্যর্থং পৃথিবীতলে।
ভীষ্মকস্য কুলে সাধ্বী রুক্মিণী নাম নামতঃ॥ আদি ৬৭-১৫৬

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও (৬৭ অধ্যায়) দেখা যায়, ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এবং তাঁর অবরজা (কনিষ্ঠা) কন্যা রুক্মিণী। এই বিবাহে মহাভারতের সম্মতি যে আছে, তাহা বুঝি পূর্বোক্ত 'সাধ্বী রুক্মিণী' এই কথায়। দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, তুমি যেমন ধর্মতঃ রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছ, আমিও তেমনি অর্জুনের ধর্মপত্নী—

লব্ধাঽহমপি তত্রৈব বসতা সব্যসাচিনা।
যথা ত্বয়া জিতা কৃষ্ণ রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা॥ বন ১২-১১৫

এখানে দ্রৌপদীও বলিতেছেন রুক্মিণী ভীষ্মকের আত্মজা, শুধু পালিতা নহেন।

সুভদ্রা ও অর্জুনের বিবাহকথা মহাভারত ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থেও আছে। রুক্মিণীর এই বিবাহ রুক্মী যে পছন্দ করেন নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শিশুপাল তো পছন্দ করিতেই পারেন না। শিশুপাল সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিয়াই তিরস্কার করিলেন, "রুক্মিণীর সঙ্গে আমারই পূর্বে বিবাহের কথা

হইয়াছিল। সভামধ্যে, বিশেষত রাজাদের সভায়, তাহার কথা মুখে আনিতে তোমার লজ্জা করে না ?"

শিশুপালঃ...বাক্যং চেদমুবাচ হ। সভা ৪৫-১৭
মৎপূর্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণ সংসৎসু পরিকীর্তয়ন্।
বিশেষতঃ পার্থিবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্॥ সভা ৪৫-১৮

রুক্মিণীর বিবাহ শিশুপালের পক্ষে ক্ষোভের বিষয় হইলেও মুনি-ঋষি-সাধু-সজ্জন সকলেই এই বিবাহ সম্মানের সহিত স্বীকার করিয়াছেন। নহিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপক হইয়া তো আর ধর্মনাশ করিতে পারিতেন না। কাজেই গালব-মুনির কথায় দেখা যায় যেমন স্বাহাতে অগ্নি ও লক্ষ্মীতে নারায়ণ প্রেমে যুক্ত (উদ্যোগ ১১৭-১০), সাবিত্রীতে যেমন সত্যবান (উদ্যোগ ১১৭-১২), দময়ন্তীতে যেমন নল (উদ্যোগ ১১৭-১৫), বৈদেহীতে যেমন রাম, তেমনই রুক্মিণীতে জনার্দন প্রেমে যুক্ত হইলেন।

বৈদেহ্যাঞ্চ যথা রামো রুক্মিণ্যাঞ্চ জনার্দনঃ। উদ্যোগ ১১৭

ইহাতে মনে হয় তখনকার দিনে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই বিবাহ কিছুমাত্র অগৌরবের বস্তু হয় নাই। তাই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণগৌরব-বর্ণনায় দেখি—যিনি (শ্রীকৃষ্ণ) একা স্বীয় বলে সমস্ত ভোজরাজগণকে পরাস্ত করিয়া যশস্বিনী দীপ্যমানা রুক্মিণীকে ভার্যারূপে জয় করিয়া আনিলেন এবং এই রুক্মিণীতে মহাত্মা রৌক্মিণেয় অর্থাৎ প্রদ্যুম্নকে জন্ম দিলেন—

যো রুক্মিণীমেকরথেন ভোজানুৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য।
উবাহ ভার্যাং যশসা জ্বলন্তীং যস্যাং জজ্ঞে রৌক্মিণেয়ো মহাত্মা॥ উদ্যোগ ৪৮-৭৪

হরিবংশে দেখা যায়, রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন ছাড়া আরও অনেক সন্ততি জন্মলাভ করেন। মূল উদ্ধৃত করিয়াই তাহা দেখান যাউক—

প্রদ্যুম্নং প্রথমং জজ্ঞে শম্বরান্তকরঃ সুতঃ॥
দ্বিতীয়শ্চারুদেষ্ণশ্চ বৃষ্ণিসিংহো মহারথঃ।
চারুভদ্রশ্চারুগর্ভঃ সুদংষ্ট্রো দ্রুম এব চ॥
সুষেণশ্চারুগুপ্তশ্চ চারুবিন্দশ্চ বীর্যবান্।
চারুবাহুঃ কনীয়াংশ্চ কন্যা চারুমতী তথা। ১৬০, ৫-৬

রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা নহেন এরূপ তর্ক করা বৃথা। অথচ এইরূপ যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াই মীমাংসাদর্শনের তর্কে বলা হইয়াছে, সুভদ্রা ছিলেন অর্জুন-

মাতুল বসুদেবের পালিতা কন্যা। কিন্তু মহাভারতে তাঁহাকে যদুবংশীয়া 'মাধবী'ই বলা হইয়াছে।

সুভদ্রাং মাধবীম্। আদি ১.১৫১

এখানে টীকাকারও বলেন সুভদ্রা মধুবংশজাতা (মধুবংশজাম্)। মাধব মধুবংশীয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের এক নাম মাধব। বাসুদেবের পরে সুভদ্রা জন্মগ্রহণ করেন—

অনুজাং বাসুদেবস্য। আদি ৬১.৪৪

অর্জুন দ্বারবতীতে গিয়া বাসুদেবের ভগ্নী ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন—

অর্জুনঃ খলু দ্বারবতীং গত্বা ভগিনীং বাসুদেবস্য সুভদ্রাং ভদ্রভাষিণীং ভার্যামুদাবহৎ। আদি ৯৫.৭৮

অর্জুন-মুখেও শুনা গেল সুভদ্রা হইলেন বসুদেবের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী—

দুহিতা বসুদেবস্য বাসুদেবস্য চ স্বসা। আদি ২১৯.১৮

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ইনি আমার ভগ্নী এবং সারণের সহোদরা এবং আমার পিতার দয়িতা সুতা—

মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা।
সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা॥ আদি ২১৯.১৭

সারণ বসুদেবেরই পুত্র (আদি ২১৯.১০)। সারণের সহোদরা হইলে সুভদ্রা বসুদেবের ঔরসজাতা কন্যা। অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহে সারণ উপস্থিত ছিলেন (আদি ২২১.৩২)। যদুবংশীয় আরও অনেকে ঐ বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন।

রুক্মিণী যে ভীষ্মকের 'আত্মজা' সেই কথা যুক্তি-চাতুরীতে 'পালিতা' বলিয়া চাপা দিবার চেষ্টা মহাভারতে নাই (বন ১২.১১৫)। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, বিদর্ভরাজ মহাত্মা ভীষ্মকের পাঁচটি পুত্র ও একটি সুন্দরী কন্যা জন্মিলেন। ছেলেদের নাম রুক্ম্যগ্রজ রুক্মরথ রুক্মবাহু রুক্মকেশ ও রুক্মমালী, ইঁহাদের ভগ্নী হইলেন সতী রুক্মিণী—

রাজাসীদ্‌ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান্।
তস্য পঞ্চাভবন্‌পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা॥
রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ।
রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষাং স্বসা সতী॥ ১০. ৫২. ২১-২২

এখানেও সতী শব্দের দ্বারা ভাগবত রুক্মিণীর এই বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। রুক্মিণীর আগাগোড়া চরিতকেও গৌরবেরই মনে করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে লইয়া শুধু ভোগ-সুখেই রত ছিলেন না। পবিত্র হিমালয়পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর মহদ্‌ঘোর ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক তপস্যা করেন। সেই তপস্যাতে পত্নী রুক্মিণীও সমান ব্রতচারিণী ছিলেন। তাহার পরে তাঁহাদের তেজস্বী পুত্র প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়। কাজেই মাতুল-কন্যাকে বিবাহের দ্বারা অর্জুনের তপস্যারও কোনো ক্ষতি হয় নাই—

ব্রহ্মচর্যং মহদ্‌ঘোরং চীর্ত্বা দ্বাদশবার্ষিকম্।
হিমবৎপার্শ্বমভ্যেত্য যো ময়া তপসার্জিতঃ॥
সমানব্রতচারিণ্যাং রুক্মিণ্যাং যোঽন্বজায়ত।
সনৎকুমারস্তেজস্বী প্রদ্যুম্নো নাম মে সুতঃ॥ সৌপ্তিক ১২, ৩০.৩১

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণপত্নী বৈধব্যব্রত পালন করিয়া জীবিত রহিলেন, কিন্তু রুক্মিণী ও আর-কয়েকটি পত্নী কৃষ্ণের সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশ করিলেন—

রুক্মিণীত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি।
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্॥ মৌষল ৭. ৭৩

মহাভারতের যুগে নারী যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন তাহারও খবর মেলে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরের আয়োজনে। জানাইয়া দেওয়া হইল, নল রাজা জীবিত আছেন কি না জানা যাইতেছে না, অতএব সূর্যোদয়ে দময়ন্তী দ্বিতীয়বার ভর্তা বরণ করিবেন—

সূর্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা ভর্তারং বরয়িষ্যতি।
নহি স জ্ঞায়তে বীরো নলো জীবতি বা ন বা॥ বন ৭০. ২৬

ভীমকন্যা দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ংবর করিবেন শুনিয়া রাজা ও রাজপুত্রগণ সেখানে যাইতে লাগিলেন (বন ৭০. ২৪)। কাজেই ইহা বৈধ ও সর্বসম্মত ছিল। বিবাহে নারীদের এইসব অধিকারের কথা তখনকার অন্যান্য বহু পুরাণেই পাওয়া যাইবে.

বিবাহের অধিকার বাদ দিলেও তখনকার দিনে নারীরা ধর্ষিতা হইলে এখনকার নারীদের মত সমাজে পরিত্যক্তা হইতেন না। ধর্ষণকারী পুরুষই অপরাধী বলিয়া গণ্য হইত। ইহাই মহাভারতের যুক্তিসংগত মত—

এবং স্ত্রী নাপরাধ্নোতি নর এবাপরাধ্যতি।
নাপরাধোঽস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি॥ শান্তি ২৬৫. ৩৮

এইখানে চিরকারিকোপাখ্যানে পিতার মহত্ত্বও ঘোষিত—

পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে সর্বাঃ প্রীয়ন্তি দেবতাঃ॥ শান্তি ২৬৫, ২১

আবার মাতাই সর্বকুলের রক্ষয়িত্রী। কোন্ সন্তান কাহার ঔরসে জাত, কাহার কি গোত্র, কে কাহার সন্তান তাহার তত্ত্ব একমাত্র জানেন মাতা। সমাজ তাহার কি খবর রাখে—

মাতা জানাতি যদ্ গোত্রং মাতা জানাতি যস্য সঃ। শান্তি ২৬৫. ৩৫

নারীদের যে শুধু সামাজিক অধিকারই তখন প্রশস্ত ছিল তাহা নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁহাদের তখন সাধনারও বিলক্ষণ অধিকার ছিল। যযাতির কন্যা মাধবী ছিলেন 'বহুগন্ধর্বদর্শনা' (উদ্যোগ ১১৬. ৩)। এখানে নীলকণ্ঠ বলেন—

গন্ধর্বাণাং দর্শনং শাস্ত্রং গীতবিদ্যাদি যস্যাম্ সা।

মহাভারতের মনস্বিনী নারীদের মধ্যে শুধু দ্রৌপদীর নামই নহে, আরও অনেকের নাম করা যায়। বনপর্বের ৫৩-অধ্যায় হইতে ৭৯-অধ্যায় পর্যন্ত দময়ন্তীর সৌন্দর্য মাধুর্য তেজ নীতি ধর্মজ্ঞান সবই চমৎকার। যাঁহার জানিতে ইচ্ছা হয় তিনি মহাভারতে মূল আখ্যানগুলি দেখিবেন।

ধীমতী সুলভার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পিঙ্গলা নামে এক বারনারীর কথা মহাভারতে (শান্তি ১৭৪. ৫৬) আছে। প্রেমের বেদনাতে তাঁহারও শান্তা বুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান জন্মিয়াছিল। পিঙ্গলার গাথার কথা তাই মোক্ষধর্মপর্বে ভীষ্মের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় (১৭৪ অধ্যায়)। তাহার শ্রোতা যুধিষ্ঠির। এই পিঙ্গলাই একদিন আশা নিরাশা জয় করিয়া পরমাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন (শান্তি ১৭৪. ৬২)।

শকুন্তলার শ্রী ও মাধুর্যের কথাই সবাই জানেন। তাঁহার তেজও কিরূপ অপরিসীম ছিল তাহা জানিতে হইলে আদিপর্বের ৭৪-অধ্যায়টি আগাগোড়া পড়িতে হয়।

ক্ষত্রিয়কন্যা বিদুলাও বহু বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিশ্রুতা ও বহুশ্রুতা তপস্বিনী হইয়াছিলেন—

ক্ষত্রধর্মরতা দান্তা বিদুলা দীর্ঘদর্শিনী।

বিশ্রুতা রাজসংসৎসু শ্রুতবাক্যা বহুশ্রুতা॥ উদ্যোগ ১৩৩. ৩

তেজের বিষয়ে বলিতে গেলে বিদুলার কথাই সকলের আগে মনে হয়।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ১৩৩ হইতে ১৩৬ পর্যন্ত পুরাপুরি চারটি অধ্যায়ই বিদুলার অগ্নিময়ী বীরবাণীতে ভরা। আপন পুত্রদের বীর্যাভাব দেখিয়া তাঁহার যে বজ্রসার বাণী তাহা চিরদিন সর্বমানবের কর্ণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে— আপন আত্মাকে অপমান করিও না, অল্পে আত্মাকে পূর্ণ করিতে যাইও না ; ভয় ছাড়, সুমহৎ কল্যাণের জন্য মনকে মুক্ত কর—

মাত্মানমবমন্যস্ব মৈনমল্পেন বীভরঃ।
মনঃ কৃত্বা সুকল্যাণং মা ভৈস্ত্বং প্রতিসংহর। উদ্যোগ ১৩৩. ৭

কুনদী অল্প জলে ভরিয়া যায়, ইন্দুরের অঞ্জলি অল্পে পূর্ণ হয়, কাপুরুষদের সহজে স্বল্পেই সন্তোষ হয়—

সুপূরা বৈ কুনদিকা সুপূরো মূষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তোষঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনৈব তুষ্যতি। উদ্যোগ ১৩৩. ৯

অতএব কেন বজ্রাহত প্রেতের মত পড়িয়া আছ? হে কাপুরুষ, উঠ, শত্রুনির্জিত হইয়া ঘুমাইয়া থাকিও না—

ত্বমেবং প্রেতবচ্ছেষে কস্মাদ্ বজ্রহতো যথা।
উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা স্বাপ্সীঃ শত্রুনির্জিতঃ। উদ্যোগ ১৩৩. ১২

হয় আপন বীর্যকে জাগ্রত কর, নয় তো শুভা ও ধ্রুবাগতি (মৃত্যুকে) আলিঙ্গন কর—

উদ্ভাবয়স্ব বীর্যং বা তাং বা গচ্ছ শুভাং গতিম্। উদ্যোগ ১৩৩. ১৮

মানুষ হও, কেবল সংখ্যাপূর্ণ করিবার মত না-নর বা না-নারী ক্লীবমাত্র হইয়া লাভ কি—

রাশিবর্ধনমাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্। উদ্যোগ ১৩৩. ২৩

অর্থাৎ মানুষের পরিচয় তাহার মনুষ্যত্বে, শুধু সংখ্যাগত আধিক্য অথবা বাহুল্য দিয়া নহে। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার চেষ্টা বৃথা বিড়ম্বনা ; আগাগোড়াই পড়িয়া দেখা উচিত। আশ্রমবাসিক-পর্বে (১৬. ২০) মনস্বিনী বিদুলার কথা আবার উল্লিখিত দেখি।

তাই নারীদের সেই যুগে যেমন সংসারধর্ম তেমনই মানুষোচিত তেজস্বিতা তেমনি জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা দেখা যায়। এইসব সাধনার সর্বপথেই মহাভারতের যুগে নারীদের গতিবিধি দেখা যায়। ভীষ্মের দ্বারা নিগৃহীতা কাশীরাজকন্যা অম্বা তপস্যা করিতে বনে গেলেন—

বনং প্রায়াৎ সা কন্যা তপসেবৃতা। উদ্যোগ ১৮৮. ১৫

বনে আশ্রমবাস করিয়া তিনি কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (উদ্যোগ ১৮৮. ১৯-২৯)। পুরুষদের মত নারীরাও তখন সংসারধর্ম পালন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাই পুত্রবধূদের লইয়া সত্যবতী বনে গমন করিলেন (আদি ১২৮. ১২)। ইঁহাদের বহুকাল পরে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীও বনে গিয়া শেষজীবনের তপস্যা পূর্ণ করেন (আশ্রমবাসিক ১৫-অধ্যায়)। সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণও বানপ্রস্থ আশ্রয় করিয়াই জীবনকে সার্থক করেন (মৌষল ৭. ৭৪)।

নারীদের এই তপস্যার অধিকার জৈন ও বৌদ্ধগণের মধ্যেও অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধযুগে মহাপ্রজাপতি গোতমী তিস্সা মিত্তা ভদ্দা ধীরা উপশমা প্রভৃতি বহু শাক্যনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এইসব তপস্বিনীদের কথা ভালো করিয়া জানিতে হইলে থেরীগাথা গ্রন্থখানি দেখিতে হয়।

জৈনদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ সন্ন্যাসিনী হন। তাঁহাদের সাধ্বী বলে। তাঁহাদের পৃথক উপাশ্রয় আছে। আচারাঙ্গ সূত্রে (২. ১. ১-১) ইঁহাদের 'ভিক্ষুণী'ও বলা হইয়াছে। প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের সময়ে ব্রাহ্মী ও সুন্দরী নামে দুই ভগ্নী প্রবজ্যা অবলম্বন করেন (জিনসেনকৃত মহাপুরাণ)। চেতকদুহিতা ব্রহ্মচারিণী চন্দনা ছিলেন মহাবীরশিষ্যা এবং ছত্রিশ হাজার ভিক্ষুণীগণমুখ্যা। তীর্থংকর অজিতনাথের তিন লক্ষ বিশ হাজার শিষ্যা ভিক্ষুণী ছিলেন। আরও বহুস্থানে ভিক্ষুণীদের কথা পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতে অল্‌বার ভক্ত নারীদের মধ্যে অণ্ডাল একজন মহাগুরু। উত্তরভারতেও বহু বৈষ্ণব ভক্তনারী হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে হেমলতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত গুরু। কবিকর্ণপুর পরমানন্দ তাঁহার শিষ্য। মনস্বিনী গঙ্গা ও জাহ্নবী বহুলোককে ভক্তিশিক্ষা ও দীক্ষা দিয়াছেন।

তন্ত্রে তো নারীরা দেবী আদ্যাশক্তিরই অংশ, 'মদংশা যোষিতা মতাঃ'। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ তাঁহার তন্ত্রসারে বলেন—

> সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
> সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা।
> গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি। ১. ৭৪

স্ত্রীর কাছে দীক্ষা শুভা, মায়ের কাছে দীক্ষার অষ্টগুণফল—

> স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ। ঐ

মহানির্বাণতন্ত্রে তো স্বয়ং শিব বলিতেছেন— হে আদ্যাশক্তি, জগতে সকল নারী তোমারই স্বরূপ, জগতে তাঁহারা আচ্ছন্নবিগ্রহ—

তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা। মহানির্বাণ ১০. ৮০

কাদম্বরীতে মহাশ্বেতা সংগীতশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারগা। তপস্যার সঙ্গে সংগীতের বিরোধ নাই। নানাপুরাণে ও প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে তাহার পরিচয় মিলিবে। অযোধ্যাপতি অজের পত্নী ইন্দুমতী ছিলেন 'ললিতে কলাবিধৌ প্রিয়শিষ্যা'। মালবিকাগ্নিমিত্র-নাটকে (অঙ্ক ৩) নারীদের নৃত্যের কথা দেখি। মহাদেবের নৃত্যানুকারে ভবানী যে দণ্ডপাদনৃত্য করিয়াছেন, তাহার খবর পাই মম্মটের কাব্যপ্রকাশে। পুরুষের নৃত্য হইল তাণ্ডব। নারীর নৃত্যের নাম লাস্য। জয়দেব ছিলেন নৃত্যকুশলা পদ্মাবতীর 'চরণচারণচক্রবর্তী'। তবে পদ্মাবতীর কথা বলিতে সাহস হয় না, কারণ নৃত্যই তাঁহার জীবনের সবখানি। কিন্তু সতী বেহুলার নৃত্যের কথা তো তেমন করিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। নৃত্য করিয়াই বেহুলা মৃত পতিকে জিয়াইলেন। বিক্রমোর্বশী-নাটকের চতুর্থ অঙ্কে চিত্রলেখা নৃত্য করিয়াছেন এবং কঠিন কঠিন রাগ-রাগিণীতে গানও করিয়াছেন। সমাজব্যবস্থাপকেরা নারীদের জন্য নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন, নারীদের জন্য প্রসাধন, নৃত্যগীত-সমাজোৎসবদর্শন বিহিত হইলেও স্বামী যখন বিদেশে থাকেন তখন তাহা স্থগিত রাখা উচিত—

প্রসাধনং নৃত্যগীতসমাজোৎসবদর্শনম্।
মাংসমদ্যাভিযোগং চ ন কুর্যাৎ প্রোষিতে প্রভৌ॥

—স্মৃতিচন্দ্রিকাধৃত ব্যবহার কাণ্ড, প্রোষিতভর্তৃকস্ত্রীধর্মাঃ, পৃ ২৯৩

সেই অবস্থায় নারীগণ অগর্হিত শিল্পের দ্বারা সময় যাপন করিবেন—

প্রোষিতে স্থবিধারৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ। ঐ পৃ ২৯২

বাৎস্যায়ন বলেন—

প্রাগ্‌যৌবনাৎ স্ত্রী কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চাধীয়ীত পিতৃগৃহে এব।

দর্শন পুরাণ ইতিহাস ও নানাবিধ কলাবিদ্যার সঙ্গে নারীরা বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে ও বিবাহের পরেও পতির অভিপ্রায়ানুসারে কামসূত্র এবং তদঙ্গবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে অধিকারিণী ছিলেন (বাৎস্যায়ন কামশাস্ত্র, তৃতীয় অধ্যায়)। টীকাকার যশোধরেন্দ্র এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কলাবিদ্যা হিসাবে নারীদের প্রতি আয়ুর্বেদশাস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। বাৎস্যায়ন ও যশোধর চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (কামশাস্ত্র তৃতীয় অধ্যায়)। নারীনৃত্যের সর্বাপেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত হইল বৃহন্নলার কাছে বিরাটগৃহে রাজকন্যাদের নৃত্যশিক্ষার কথা—

স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ। বিরাট ১১.১২

বৌদ্ধযুগে দেখা যায়, সংঘমিত্তা হেমা ও অগ্‌গিমিত্তা ত্রিবিধবিজ্ঞান-পারদর্শিনী (দীপবংশ, ১৫ পর্ব)। সীবলা ও মহারুহা বিনয় সুত্তপিটক ও অভিধম্ম পড়াইতেন (ঐ)। অঞ্জলি ছিলেন শাস্ত্রে ও দৈবশক্তিতে অধিকারিণী। থেরীগাথায় বহু নারীর নানা বিষয়ে গভীর সাধনা ও বিদ্যার পরিচয় মেলে।

খ্রীস্টীয় ১১৮৩ সালে কাকতীয় রাজকন্যা রুদ্রদেবী বাংলাদেশ হইতে পরমশৈব বিশ্বেশ্বরকে দক্ষিণদেশে নিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। মালকাপুর-শাসনে দেখা যায়, এই কন্যা পুরুষের মত রাজা হইয়া প্রবলপ্রতাপে এবং জ্ঞান ও কলার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্যশাসন করেন। ইহার এক শতাব্দী পরে বিজয়নগরসম্রাট কম্পরায়ের মহিষী গঙ্গাদেবী ছিলেন জ্ঞানে ও কাব্যরচনায় প্রখ্যাত। তাঞ্জোরপতি রঘুনাথভূপের সভাকবি ছিলেন স্ত্রীকবি মধুরবাণী। মালাবারের প্রধান সপ্তকবির চারিজনই স্ত্রীলোক। তাঁহাদের মধ্যে নারীকবি অব্যার অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। লীলাবতীর নাম সবাই জানেন। বাংলাদেশে খনার নাম ঘরে ঘরে। মণ্ডনমিশ্রের পত্নীর কথাও সুবিদিত। দর্শনশাস্ত্রে উভয়ভারতীর অসাধারণ অধিকার ছিল। মিথিলাধিপতি পদ্মসিংহের রানী বিশ্বাসদেবী ছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রের প্রখ্যাত আচার্য। বহু নারীকবির রচনার পরিচয় সংস্কৃতসাহিত্যে পাওয়া যায়। তাহা লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি পুঁথি হইয়া উঠে এবং সে বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতও হইয়াছে। অধ্যাপক কানে-লিখিত ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে নারীদের রচিত বহু স্মৃতিগ্রন্থের পরিচয় মেলে।

বীরনারী হিসাবেও ভারতের বহু মহিলা প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদেও সেইরূপ নারীদের পরিচয় মেলে। আহমদনগরের রানী চাঁদবিবি মোঘল সেনাপতিকে যুদ্ধে বিস্মিত করিয়া দেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ স্যর হুগ্‌ রোজকে সহজে ছাড়িয়া দেন নাই। ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনীর বীরত্ব আর-এক রকমের। এইসব মহীয়সী মহিলা যেভাবে প্রাণ দিয়াছেন তেমন করিয়া

প্রাণ দিতে বীরপুরুষরাও পারেন নাই। স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা সতীদের আত্মত্যাগের মধ্যে যে শান্ত বীরত্ব আছে তাহার মহত্ত্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বাংলাদেশে হঠী বিদ্যালংকার প্রভৃতি নারী নানাশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কাশী যখন মোগলশাসনের শেষভাগে নিষ্প্রভ ও অশক্ত হইয়া পড়িল তখন তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন দুই নারী। একজন রানী ভবানী আর-একজন অহল্যাবাঈ। কাশীকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে নবজীবন দান করিলেন।

কাজেই নারীরা যে এদেশে শুধু ঘরে ও সংসারেই রাজত্ব করিয়াছেন তাহা নহে। মহাভারতে দেখি, সেখানেও সকলের আহারে-বিহারে নারীরাই কর্তৃত্ব করিতেন। পত্নীরা স্বামীদের কাছে সম্মানও যথেষ্ট পাইয়াছেন। পথশ্রান্তা দ্রৌপদীর পথখেদ দূর করিতে নকুল ও সহদেব তাঁহার পাদসংবাহনও করিয়াছেন—

তস্যা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ।
করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শতকৈঃ সংববাহতুঃ। বন ১৪৪-২০

নারীদের ভালো দিকই দেখান হইল। তাঁহাদের মধ্যে মন্দও কিছুকিছু যে না ছিল তাহা নহে। মহাভারতের যুগেও দেখা যায়, নারীদের মধ্যে সুরাপানাদি দোষ বেশ ছিল। খাণ্ডবদাহপর্বে দেখা যায়, দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতি সহ বড় বড় ঘরের নারীরা তাহাতে ছিলেন। সেখানেও উৎসবের আনন্দে কোনো নারী হাসিতেছেন, কেহ হল্লা করিতেছেন, কেহ নাচিতেছেন, কেহ সুরাপান করিতেছেন—

কাশ্চিৎ প্রহৃষ্টা ননৃতুশ্চুক্রুশুশ্চ তথাপরাঃ।
জহসুশ্চাপরা নার্যঃ পপুশ্চান্যা বরাসবম্। আদি ২২২-২৪

শিশুপালবধকাব্যেও রেবতী-বলরামের সুরাপান-উৎসব চমৎকার বর্ণিত দেখা যায়—

ঘূর্ণয়ন্ মদিরাস্বাদমদপাটলিতদ্যুতী।
রেবতীবদনোচ্ছিষ্টপরিপূতপুটে দৃশৌ। ২.১৬

তবে পাণিনির (৩.২.৮) বার্তিকে (২) নারীদের সুরাপান পাতক বলিয়াই

উল্লিখিত। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও সমাজে নারীদের মধ্যে সুরার বিলক্ষণ প্রচলন ছিল।

সহমরণপ্রথার কথা পূর্বে হইয়াছে। এই প্রথা আর্যদের মধ্যে খুব প্রাচীন বৈদিক যুগে ছিল না। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন, বরং এই প্রথা প্রাচীনকালে য়ুরোপে ও পশ্চিম এশিয়ায় আর্যেতর জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এদেশে আর্যদের মধ্যে এই প্রথা বিদেশী অনার্যদের নিকট হইতে আমদানি করা। পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলাদি ভূভাগে তখন গ্রীকদের প্রভাব ছিল বেশি। খ্রীস্টের তিন-চারিশত বৎসর পূর্বে সেইসব স্থানে সতীদাহ খুব বেশি রকম প্রচলিত ছিল।[১৩]

বেদের যেসব মন্ত্র এই প্রথার প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাদের অর্থ কিন্তু সতীদাহকে সমর্থন করে না। পরবর্তী স্মৃতি ও ব্যাখ্যানাদির রচয়িতারা বরং ইহার সমর্থন করেন। অথর্বের একটি মন্ত্র আছে—

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা, ইত্যাদি। ১৮. ৩. ১

ভাষ্যে স্বামীর চিতায় আরোহণ-সমর্থনে শঙ্করাচার্য শ্রুতিবাক্য না পাইয়া স্মৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

স্মর্যতে হি, ভর্তারম্ উদ্ধরেন্নারী প্রবিষ্টা সহ পাবকম্।

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রেও এই একই মত দেখা যায়। ঋগ্বেদের যে মন্ত্রটি এখন সতীদাহের প্রধান সমর্থকরূপে ব্যবহৃত, রমেশ দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন তাহার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলে আছে, 'আরোহন্তু জনয়ো যোনিরগ্রে' (ঋগ্বেদ ১০, ১৮, ৭), কিন্তু তাহা বদলাইয়া করা হইয়াছে 'যোনিমগ্নে'।

ঋগ্বেদের মূল হইল এই—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিরগ্রে॥ ১০. ১৮. ৭

সায়ণও ইহার ভাষ্যে বলেন, এইসব অবিধবা শোভনপতিকা নারী স্নেহসিক্ত ও অঞ্জনে মণ্ডিত হইয়া আপন ঘরে প্রবেশ করুন। অশ্রুজলহীন ও নীরোগ হইয়া শোভন রত্নে মণ্ডিতা হইয়া এইসব ভার্যা প্রথমেই আপন ঘরে আসুন।

১৩ *Oxford History of India*, V. A. Smith, p 665

ইহার পরের মন্ত্রটিতেও এই কথারই সমর্থন—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।

হস্তগ্রাভস্য দিধি যোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ॥ ঋগ্বেদ ১০. ১৮. ৮

সায়ণ ইহার অর্থ করেন, হে মৃতের পত্নি, পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত জীবলোকের উদ্দেশ্যে এই স্থান হইতে উঠিয়া এস। গতপ্রাণ পতির পাশে কেন এখন শুইয়া আছ, সেখান হইতে উঠিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ ও গর্ভাধান করিয়াছিলেন তাঁহার পত্নীজনোচিত কাজ তুমি যথেষ্ট করিয়াছ, এখন উঠিয়া এস।

এই মন্ত্রটি অথর্ববেদের অষ্টাদশ কাণ্ডের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র। আশ্বলায়নও (৪. ২. ৩) এই মন্ত্রের সমর্থন করিয়াছেন।[১৪]

এইখানে ভট্টভাস্কর ভাষ্য করেন সেই নারীকে পতিস্থানীয় দেবর ধরিয়া উঠাইবেন। কারণ প্রাচীন বিধি আছে—

তামুত্থাপয়েদ্ দেবরঃ পতিস্থানীয়োঽন্তেবাসী

জরদ্দাসো বোদীর্ষ্ব নার্যভিজীবলোকমিতি॥

পতিস্থানীয় দেবর, স্বামীর ছাত্র বা বৃদ্ধ দাস সেই নারীকে সেখান হইতে উঠাইতে গিয়া বলিবে, হে নারী, জীবলোকে ফিরিয়া এস (উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকম্)। মহাভারতে দেখা যায় মাদ্রী পতিসহ চিতারোহণ করেন, কিন্তু কুন্তী সংসারের ভার লইয়া রহিলেন। বাসুদেবসহ শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ সহমৃতা হইলেও তখনকার বহু সতী সহমৃতা হন নাই। দক্ষ প্রভৃতি স্মৃতিতে স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণের প্রশংসা আছে—

মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।

সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৩০.১৯.২০

স্বামীর সহমৃতা হইলে নারী শুভাচারা হয়েন এবং স্বর্গলাভ করেন। বিধবার ব্রহ্মচর্যের প্রশংসা মনু বিশেষভাবেই করিয়াছেন—

মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।

স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫. ১৬০

কাজেই সহমরণপ্রথা যখন প্রচলিত হইল তখনও সকলে ইহা স্বীকার করেন নাই। মহানির্বাণ-তন্ত্র তো স্পষ্টভাবেই বলিলেন, স্বামীর সঙ্গে কুলকামিনীকে কখনও দগ্ধ করিবে না—

ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্॥ ১০, ৭৯

---

১৪ *Mysore Edn* C. O. L. S., No. 26, Vol. 1, p 327

সামাজিক অবস্থা : বিবাহ

মানুষ সামাজিক জীব। ঘর-সংসার বাঁধিয়া পরিবার পল্লী সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কুলোচিত আচার পালন করিয়া মানুষ জীবন যাপন করে। তবে ইহার মধ্যেও দেশভেদে কুলভেদে আচার-বিচারের ইতরবিশেষ দেখা যায়।

ভারতে আর্যদেরও পূর্বে দ্রবিড়দের বাস ছিল, দ্রবিড়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল রীতিমত উচ্চ ধরনের। তাহার পূর্বেও বহু জাতি নানা রকম সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া এইদেশে বাস করিয়া গিয়াছে। আর্যরা এইদেশে আসিয়া কতকটা নিজেদের প্রাচীন আচার-বিচার বজায় রাখিতে পারিল এবং চারিদিকের প্রভাবে ও জাতিগত মিশ্রণের ফলে কতকটা চারিদিকের আচার-বিচার গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইল। আর্যপূর্ব নাগ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি আর্যজাতির বিবাহ সর্বদাই হইত। দক্ষিণের চেররা নাগবংশীয়, ইহা ছাড়া আরও বহু নাগবংশীয় এখনও ভারতের নানা স্থানে আছে।[১৫]

পূর্বে বৈদিকযুগে বরকন্যার বিবাহ হইত যৌবনে। তখন জাতিভেদ প্রবর্তিত হয় নাই এবং প্রবর্তিত হইয়া থাকিলেও তাহার তেমন বাঁধাবাঁধি ছিল না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হইলেও সামাজিক কোনো অসুবিধা ঘটিত না। কিন্তু পরে যখন জাতিভেদ ভালো করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ছেলেমেয়েদেরই পছন্দের উপর বিবাহ-ব্যাপারটা ছাড়িয়া দেওয়া আর চলিল না। কারণ এইসব পছন্দ তো আর জাতিকুল বাঁচাইয়া হইবার কথা নহে। কাজেই নামে বর থাকিলেও বরণপ্রথাটি গেল। গুরুজনদের ব্যবস্থা অনুসারে অপ্রাপ্তবয়স্ক বরকন্যাকেই বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্তিত হইল।

আর্যদের মধ্যে পুরুষদেরই ছিল প্রাধান্য। দ্রবিড়দের সামাজিক ব্যবস্থাতে মেয়েদেরই ছিল মুখ্যতা। দ্রবিড়দের মধ্যে মেয়েদের অনেকটা স্বেচ্ছাচার চলিত। সেখানে আর্যদের যাগযজ্ঞ গিয়া পৌঁছিলেও তাহাদের মধ্যে দ্রবিড়-জাতিসুলভ স্বাধীন মেয়েদের প্রভাব বজায় ছিল। মেয়েরা সেখানে যজ্ঞাগ্নি ফুঁ দিয়া জ্বালাইতেন (মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, সভা, ৩১.২৯)। সেখানে নারীরা

১৫ *Mysore Tribes and Castes Vol. II, p 476*

দেবতার বরে 'অপ্রতিবারিতা' 'স্বৈরিণী' (ঐ ৩১. ৩৮)। এসব কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। শ্রীযুত নঞ্জুনদায়্যা এবং অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার মনে করেন স্বেচ্ছাবিহারিণী দ্রবিড় কন্যাদের মধ্যে বিবাহের পূর্বে যে ব্যভিচার দেখা যাইত তাহা দেখিয়াই হয়তো এদেশে আর্য বরকন্যাদের বিবাহের বয়স সীমাবদ্ধ করা হইল।[১৬]

মন্বাদি স্মৃতিতে আমরা আট প্রকারের বিবাহের উল্লেখ পাই। তাহার মধ্যে ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য এই চতুর্বিধ বিবাহই মন্বাদির প্রশংসিত। প্রচলিত থাকিলেও আসুর গান্ধর্ব রাক্ষস পৈশাচ এই চতুর্বিধ বিবাহ নিন্দিত। আসুর-বিবাহে কন্যার জন্য ধন গৃহীত হয়, গান্ধর্ব-বিবাহে বরকন্যা কামতঃ পরস্পরে যুক্ত হয়, অনিচ্ছায় কন্যা হৃত হইলে হয় রাক্ষস-বিবাহ, সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাকে গোপনে সংগ্রহ করাকে পৈশাচ-বিবাহ বলে (মনু. ৩. ২১-৩৪)।

সগোত্রা সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করা চলে না। বাংলাদেশে গোধূলিতে বিবাহ হইলেও দিনে বিবাহ হয় না। ভারতের আর-সব স্থানে দিবাভাগে বিবাহ হয়। মহারাষ্ট্র গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে এবং ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে দিনেও বিবাহ হয়। অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার বলেন, মহীশূর প্রভৃতি স্থানের শুদ্ধবেদাচারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে দিবা-বিবাহ প্রচলিত। বর-যাত্রীরা বিবাহের পূর্বরাত্রিতে কন্যার বাড়ির অতিথি হন। সকালে বরকন্যা স্নাত ভূষিত হইলে বরণ ও মুখদর্শন হয়। তারপর মধুপর্ক ও বিবাহ-আচার চলিতে থাকে। বিবাহহোম পানিগ্রহণ লাজ-হোম সপ্তপদী প্রভৃতি তখনই হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় বরকন্যা অরুন্ধতী দর্শন করেন। সন্ধ্যার সময় গৃহপ্রবেশ-হোম সম্পন্ন হয়। তাহার পর স্থালীপাক হইয়া ঔপাসনে অগ্নিহোত্র হয়।[১৭]

এই যে অনুষ্ঠানপূর্বক বিবাহ এবং পতিপত্নীর পবিত্র সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা, ইহা একদিনে সাধিত হয় নাই। সমাজের মধ্যে বহুযুগের সংস্কৃতির ও সভ্যতার ফলে ক্রমে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান স্থাপিত হইলেও তাহার আশেপাশে বহুকাল ধরিয়া নানা চ্যুতি-বিচ্যুতিও চলিয়াছে। প্রবল বৃষ্টি হইলে যেমন কতক জল নদীর ধারাপথে চলে, প্রবলতর বন্যা হইলে

---

১৬ *Mysore Tribes and Castes, Vol. II, p 35*

১৭ ঐ *pp 329-349*

কতকটা জল নদীর ধারাপথে চলিলেও আশেপাশে বন্যার অনেকখানি প্লাবন চলে, তেমনি কতক মানুষের মধ্যে এই সামাজিক শৃঙ্খলা চলিলেও মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তির বন্যাও যে আশেপাশে বিলক্ষণ বহিয়া যাইত তাহার পরিচয় প্রাচীন বেদ-পুরাণেও পাওয়া যায়। খাল কাটিয়া বন্যা রোধ করা বরং সহজ, কিন্তু বিধিবিধানের দ্বারা মানবের এই দুর্বার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা কঠিন। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যই তাহার সাক্ষ্য দিবে। আর যেসব মুনিঋষিরা সমাজকে সংযত করিতেন সেই প্রবলদেবতা কামের কাছে তাঁহারাও কম বিড়ম্বিত হন নাই। তাহা ছাড়া যেসব দেবতার দোহাই দিয়া মানুষকে নিবৃত্ত করিতে হইবে তাঁহাদেরও বহু দুর্গতির কথা শাস্ত্রে পুরাণে বর্ণিত। আইনে দেখা যায় বটে ব্যভিচারীদের প্রতি কঠিন দণ্ডের বিধান ছিল। বরুণপ্রঘাস নামে বরুণপাশমোচনের জন্য একটি অনুষ্ঠান আষাঢ় পূর্ণিমায় করিতে হইত।[১৮] ইহাতে স্ত্রীকে তাহার গোপন প্রেমাস্পদের নাম প্রকাশ্যে বিজ্ঞপিত করিতে হইত।

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে দেখা যায়, মাতা পাতিব্রত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে সেই দোষস্খলনের জন্য যজ্ঞকালে ব্রতীকে মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। সামান্য এক-আধটু পাঠান্তর থাকিলেও আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে (১. ৯. ৯.) আপস্তম্ব-মন্ত্রপাঠে (২. ১৯. ১) ও হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্রে (২. ১০. ৭) সেই একই কথা। মনু পর্যন্ত এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি সেইজন্য মন্ত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন—

যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্যপতিব্রতা।
তন্মে রেতঃ পিতা বৃঙ্‌ক্তামিত্যস্যৈতন্নিদর্শনম্॥ ৯. ২০

অর্থাৎ মাতার ব্যভিচারজনিত দোষ পিতার দ্বারা শুদ্ধ হউক। এইজন্যই কি কাঠক-সংহিতাতে (৩০. ১) ব্রাহ্মণের পিতামাতার খবর জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ ছিল, ধর্মশাস্ত্রে ও দৈবকর্মে ব্রাহ্মণপরীক্ষা (শঙ্খ-সংহিতা ১৩. ১) নিষিদ্ধ ছিল।

পুরুষদের ব্যভিচারের কথাও বহুস্থলে উল্লিখিত আছে। ইন্দ্র-অহল্যার কথা সকলেই জানেন। যজুর্বেদে তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৭. ৪. ১৯. ২-৩)

১৮ মৈত্রায়ণী-সংহিতা ১, ১০. ১১ ; শতপথ-ব্রাহ্মণ ২. ৫. ২. ২০

এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৩. ৩০..৩১) দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় শূদ্রাতেও আর্যগণ ব্যভিচাররত হইতেন। বৃহদারণ্যক-উপনিষদের এমন কয়েকটি মন্ত্র আছে (৬. ৪. ৯-১১) যাহা অনুবাদ করাও অসম্ভব।

তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৬. ৮. ৩ মন্ত্র) এবং মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৩. ৪. ৭ মন্ত্র) দেখিলে বুঝা যায় তখনকার দিনেও নৈতিক বিষয়ে বেশি কড়াকড়ি করিলে চলিত না। স্মৃতি ও অর্থশাস্ত্রে গূঢ়োৎপন্ন সন্তানদের কথা ও ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছে। বোধায়ন (২. ২. ৩৪) ও আপস্তম্ব (২. ১৩. ৭) ধর্মসূত্রে বলেন যে, জনকের কথায় বুঝা যায় কোনোকালে স্ত্রীগণ ছিল সাধারণভোগ্যা। শ্বেতকেতু তাহা নিবৃত্ত করেন। নারীদের এই দুর্বলতার কথা বৃহস্পতিও (২. ৩০) উল্লেখ করিয়াছেন।[১৯]

বেদে যম-যমীর উপাখ্যানের (ঋগ্বেদ ১০. ১৩) হয়তো অন্য কোনো অর্থ আছে। ঋগ্বেদে (১০. ৬১) যে আপন দুহিতার প্রতি প্রজাপতির কামমোহের কথা আছে তাহার অর্থ কুমারিলভট্ট দেখাইয়াছেন, উষার দিকে সূর্যের ধাবমান হইবার কথা, কাজেই এইসব মন্ত্রের দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না। ঐতরেয় (৩. ৩৩) এবং শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১. ৭. ৪. ১) এই প্রসঙ্গের অন্য ব্যাখ্যা আছে। কখনও কখনও ভ্রাতা বা জাররূপে দুর্ভাগ্য আসিয়া গর্ভ নষ্ট করে (ঋগ্বেদ ১০. ১৬২. ৫), কখনও নিদ্রাবস্থায় দুষ্টসত্ত্বেরা ভ্রাতা বা পিতা হইয়া সঙ্গত হয় (অথর্ব ৮. ৬. ৭)। এইসব মন্ত্রেরও হয়তো অন্য কোনো হেতু থাকিতে পারে। তবে অথর্ব-ব্রাত্যকাণ্ডে (১৫. ২. ৫) ব্রাত্যের সঙ্গে পুংশ্চলীর উল্লেখ করায় বুঝা যায়, পরপুরুষপ্রিয়া ব্যভিচাররতা রমণীর তখনও অভাব ছিল না। অথর্বের ১৪. ১. ৩৬ মন্ত্রে সূর্যার প্রসঙ্গে আমরা 'মহানগ্ন্যাঃ' শব্দ পাই। অথর্বে (২০.১৩৬.৫ মন্ত্রে) 'মহানগ্নী' শব্দ দেখি। মহানগ্নী শব্দও নির্লজ্জা-ব্যভিচারিণী অর্থে প্রযুক্ত। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৩০.১৬) 'অতিত্বরী বিজর্জরা' শব্দেও তাহাই বুঝায়। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (৩.৪.২.১) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৩০.৬) 'কুমারী-পুত্র' শব্দ দেখা যায়। অথর্বে (৫.৫.৮) 'কানীন-পুত্রের' কথা আছে। ঋগ্বেদে (৪.১৯.৯) দেখা যায়, অগ্রূবকে বল্মীক কীটেরা খাইতেছিল, ইন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করেন। সায়ণ বলেন, সেই সন্তানের মাতার নাম অগ্রূ। অনেকে মনে করেন বিবাহের অগ্রে জাত বলিয়া অগ্রূব। এই রকম সন্তানকে

Mysore Tribes and Castes, Vol II, p 361

নির্জনে প্রসব করিয়া কোথাও ফেলিয়া দেওয়া হইত। ঋগ্বেদের ২.২৯.১ মন্ত্রে আদিত্যগণের স্তবে বুঝা যায়, দেবতা 'রহস্থূঃ'কে ক্ষমা করিতেন। 'রহস্থূঃ' অর্থে সায়ণ বলেন, রহসি অন্যৈরজ্ঞাতপ্রদেশে সূয়তে, ইতি রহস্থূর্ব্যভিচারিণী— যে ব্যভিচারিণী গোপনস্থানে প্রসব করিয়া যায়।

নারীপুরুষদের মিলনস্থানে 'সমন' প্রভৃতিতে লোকে পতি খুঁজিত।[২০] সমন প্রভৃতি মেলার মিলনস্থানে পুরুষ-নারীর অবাধ ও অবৈধ মিলনও ঘটিত। সেখানে অনেক দুর্নীতিও প্রশ্রয় পাইত। এইরূপ সমনে সুন্দর মধুর স্মিতহাস্যময়ী নারীদের উল্লেখ দেখা যায়—

সমনেব যোষাঃ কল্যাণ্যস্ময়মানাসঃ। ঋগ্বেদ ৪.৫৮.৮

ঋগ্বেদের ৬.৭৫.৪ মন্ত্রেও 'সমনেব যোষা' পদ দেখা যায়। ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলে আছে, "সমনং ন যোষা" (১০.১৬৮.২)।

এইসব স্খলন কখনও কখনও ঘটিত সাংসারিক অভাবে এবং রক্ষাকর্তার অভাবে। যে কন্যার পিতা বা ভ্রাতা থাকিত না তাহাদের অনেক সময় এইরূপ দুর্গতি ঘটিত (ঋগ্বেদ ১.১২৪.৭)। বিবাহবিনা এইরূপে পিতৃগৃহে যেসব কন্যার বয়স চলিয়া যাইত তাহাদিগকে 'অমাজুর' বলিত।[২১] ঘোষা ছিলেন এইরূপ কন্যা (ঋগ্বেদ ১.১১৭.৭)।

ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে 'পুত্রিকা' বলিত। আর-এক কারণেও পুত্রিকাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহিত না। কারণ তাহার সন্তান তাহার মাতামহের বংশরক্ষা করিত।[২২]

ঋগ্বেদে দেখা যায়, ভ্রাতৃহীনা কন্যারা অনেক সময় পতিদ্বেষিণী দুরাচারা স্বৈরিণী পাপরতা মিথ্যা ও অসত্যপরায়ণা হইয়া গভীর নরকগামিনী হইত—

অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যন্তঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা ইদম্পদমজনতা গভীরং॥ ৪.৭.৫

অথর্ব বেদে আছে, ভ্রাতৃহীনা যুবতী লোহিতবস্ত্রা কন্যা যেন চলিয়াছে—

যন্তি যোষিতো লোহিতবাসসঃ
অভ্রাতর ইব জাময়ঃ। ১.১৭.১

---

২০ অথর্ব ২.৩৬.১ ; ঋগ্বেদ ৭.২.৫

২১ ঋগ্বেদ ২.১৭.৭ ; ৮.২১.১৫ ; ১০.৩৯.৩

২২ গৌতম ধর্মসূত্র ২৮.২০ ; বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র ১৭.১৭ ; মনু ৯.১২৭-১৪০

ভ্রূণহত্যাও যে তখন চলিত তাহা বুঝি সর্বত্র তাহার বিরুদ্ধে উচ্চারিত সব বিধি-বিধানের দ্বারা। ভ্রূণহত্যা অতি নিন্দিত পাতক।[২৩] আরণ্যকে এবং উপনিষদেও ভ্রূণহত্যা বহুনিন্দিত।[২৪] শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রেও (১৬.১৮.১৯) এইকথা পাই। সেই যুগে কন্যাহত্যার কথা বিশেষ শোনা যায় না, অথচ ভ্রূণহত্যার এত নিন্দা দেখিয়া মনে হয়, ভারতে পরে কোনো-কোনো শ্রেণীর মধ্যে যে কন্যাহত্যা চলিত হইয়াছিল তাহা খুব প্রাচীন কালের নহে।

ক্রমে যখন বিবাহপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও ব্যভিচার ও দুর্নীতি একেবারে বিদূরিত হয় নাই। কোনো দেশে কোনোকালেই তাহা হয় না। তবে জাতিভেদের যুগে ভারতের স্ত্রীগণের মধ্যে ব্যভিচার ঘটিলে পাছে অজ্ঞাতসারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, তাই অনেক সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু তবু তখনও শুধু এই কারণে পত্নীকে ত্যাগ করা চলে নাই (নারদ ১২. ৯০)। পরাশরের (১০, ১৫) মতে ব্যভিচারের ফলে সন্তান যদি জন্মে এবং স্ত্রী যদি কুল ছাড়িয়া যায় তবেই তাহাকে ত্যাগ করা চলে। হারিত (৩. ১৩) এরূপস্থলেও স্ত্রীত্যাগের বিরুদ্ধে।[২৫]

বৈজ্ঞানিকদের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে সবই ছিল অগ্নিময়, বাষ্পময়; তাহার পর ক্রমে স্থিরা শীতলা হইলে ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বক্ষে জীবকুল প্রতিষ্ঠিত হইল। তেমনি সমাজেও প্রথমে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল যুগ যায়। তাহার পর ক্রমে সুব্যবস্থিত সংসারযাত্রার যুগ আসে। তখনও যে মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা সর্বতোভাবে দূর হয় তাহা নহে। আজও কোনো দেশেই তাহা হয় নাই। সব দেশেরই বিচারশালার ফলাফল দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ভারতের বহু পুরাতন কথা লোকে স্মরণে রাখিয়াছে, তাই তাহার অনেক গলদের খবর এখনও পাওয়া যায়। এমনকি একদিন যে বিবাহপ্রথাও সমাজে ছিল না সেকথা অন্যসব দেশ ভুলিয়া গেলেও ভারতবর্ষ ভোলে নাই। সেইসব অতিপুরাতন উচ্ছৃঙ্খল

২৩ কপিষ্ঠল-সং, ৪৭.৭ ; কাঠক-সং, ৩১.৭ ; তৈত্তিরীয়-ব্র. ৩.৮.২০.১ ; ৩.৯.১৫.৯ ; ৩,২,৮,১১ ; তৈত্তিরীয়-সং.৬.৬.১০.৩ ; মৈত্রায়ণী-সং. ৪.১.৯।

২৪ তৈত্তিরীয়-আরণ্যক, ২.৭.৩ ; ২.৮.২ ; ২.৮.৩ ; ১০.১.১৫ ; কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ-উপনিষৎ, ৩.১ ; বৃহদারণ্যক, ৪.৩.২২ ; মহানারায়ণ, ৬.১১ ; ১৭.৭ ; ১০.১ ; নৃসিংহ-পূর্বতাপনী, ৫.৪ ; ইত্যাদি।

২৫ *Mysore Tribes and Castes*, Vol. II, p, 356

যুগের কথা ভারতবর্ষ এখনও রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এই জন্য সমাজবিজ্ঞানের আলোচকদের বহু ধন্যবাদ ভারতের প্রাপ্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বোধায়ন ধর্মসূত্রে ও আপস্তম্বে সেই যুগের উল্লেখ আছে যে যুগে বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাভারতেও তাহার উল্লেখ পাই। উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন (আদি ১২২. ৯)। তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতু বিবাহের মর্যাদা স্থাপন করিলেন (ঐ ১০)। উদ্দালক এবং শ্বেতকেতুর সমক্ষেই এক ব্রাহ্মণ উদ্দালক-পত্নীর হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। ইহাতে শ্বেতকেতু জ্বলিয়া উঠিলেন (ঐ ১১-১৩)। পিতা বুঝাইলেন, বাবা রাগ করিও না, ইহাই সনাতন ধর্ম। সংসারে সর্ববর্ণের নারীরাই এই বিষয়ে অনাবৃত অর্থাৎ স্বেচ্ছাবিহারিণী—

মা তাত কোপং কার্ষীত্ত্বমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ।
অনাবৃতা হি সর্বেষাং বর্ণনামঙ্গনা ভুবি ॥ আদি ১৪

সনাতনধর্ম হইলেও শ্বেতকেতু ঐ নিকৃষ্ট ধর্ম না মানিয়া তাহার স্থানে উত্তম নূতন ধর্ম স্থাপন করিলেন। তখন হইতে বিবাহ ছাড়া স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম পাপ হইল (ঐ ১৬-২০)। প্রথা শুধু সনাতন হইলেই হইবে না, তাহা ভালো কি মন্দ তাহাও দেখিতে হইবে। মহর্ষি শ্বেতকেতু সেইভাবে দেখিয়া-ছিলেন বলিয়াই আজ আমাদের সমাজে বিবাহপ্রথা চলিয়াছে, নহিলে সেই সনাতন প্রথায় নারী-পুরুষের অবাধ মিলন আজও চলিত।

বোধায়ন-ধর্মসূত্রে দেখা যায়, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথমে ঔরসপুত্রের দাবি এই কথা আচার্য ঔপজঙ্ঘনি বলেন (২. ২. ৩৩)। ঔপজঙ্ঘনিকে রাজা জনক জিজ্ঞাসা করেন, পুত্র কাহার, উৎপাদয়িতার না ক্ষেত্রস্বামীর অর্থাৎ জননীর পতির? তদুত্তরে ঔপজঙ্ঘনি জনককে পুরাতন কথা বলেন, একবার সত্যযুগে যমরাজা আমাকে (ঔপজঙ্ঘনিকে) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, পরস্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র কি উৎপাদয়িতার অথবা সেই স্ত্রীর স্বামীর—

যমঃ কৃতে যুগে ঔপজঙ্ঘনিমাহূয় প্রপ্রচ্ছ
পরদারেষুৎপাদিতঃ পুত্রঃ কিং জনয়িতুরিতি উতাহো ক্ষেত্রিণ ইতি।
—বোধায়ন-ধর্মসূত্রে গোবিন্দস্বামী প্রণীত বিবরণ ২ ২.৩৪

সন্তান জনয়িতারই হইবে ইহাই নিশ্চয় করিয়া সেইকথা আমি তখন যমপুরে বলিয়াছিলাম—

এবং প্রজা জনয়িতুরেবেতি নিশ্চিত্য তদিদং পুরা যমস্য সদনে জনয়িতুঃ পুত্রমব্রুবন্। (ঐ)

কিন্তু এখন আমার আর সেই মত নাই। এখন বুঝিতেছি সেই প্রথা ভালো নহে। কাজেই স্ত্রীগণের সঙ্গে যাহারা পতি না হইয়াও চরণ করেন তাঁহাদের আমি আর এখন সহিতে পারি না—

সম্প্রতি অহং নের্ষ্যামি ন সহে স্ত্রীণাং চরন্তং পুরুষং নের্ষ্যামি । ঐ

হে জনক, পূর্বে যে আমি ধর্মরাজ যমের ভবনে বলিয়াছিলাম যে, ঋষিগণ বলিয়াছেন জনয়িতারই সন্তান ক্ষেত্রস্বামীর অর্থাৎ জননীর পতির নহে—

হে জনক, পুরা যস্মাদ্ যমস্য ধর্মরাজস্য সদমে স্থানে বেশ্মনি জনয়িতুরেব পুত্রমব্রুবন্ ঋষয়ো, ন ক্ষেত্রিণ ইতি। (ঐ)

কিন্তু ধর্মরাজ যমরাজ সকাশে নিশ্চিত অর্থ তো মিথ্যা হইতে পারে না—

নহি যমরাজসকাশে নিশ্চিতোঽর্থো মিথ্যা ভবিতুমর্হতি। ঐ

ইহাই ঔপজঙ্ঘনি মুনির মত—

ইতি ঔপজঙ্ঘনের্মুনের্মতম্। ঐ

কাজেই দেখা গেল, ঔপজঙ্ঘনি পুরাতন ঋষিদের বাক্য এবং যমরাজার ভবনে তাঁহার নিজেরই পূর্বনিশ্চয় হইলেও পরক্ষেত্রে উৎপাদিত পুত্র জনয়িতারই হইবে পরে আর এইকথা পছন্দ করিতেছেন না। বোধায়ন-ধর্মসূত্রে মূল সূত্রটি এই—

ইদানীমহমীর্ষ্যামি স্ত্রীণাং জনক নো পুরা
যতো যমস্য সদনে জনয়িতুঃ পুত্রমব্রুবম্। ঐ ২. ২. ৩৪

বোধায়ন আরও বলেন, রেতোধা অর্থাৎ রেতঃসেকের দ্বারা উৎপাদনকারীই যমলোকে গিয়া পুত্র অর্থাৎ পুত্রকৃত্যের ফললাভ করে। তাই সকলে ভয়ে পররেতঃ হইতে ভার্যাকে রক্ষা করে—

রেতোধা পুত্রং নয়তি পরেত্য যমসাদনে।
তস্মাদ্ ভার্য্যাং রক্ষন্তি বিভ্যন্তঃ পররেতসঃ। ঐ ২. ২. ৩৫

তাই জনক বলিলেন, অপ্রমত্ত হইয়া নিজ বংশধারা রক্ষা কর, তোমাদের ক্ষেত্রে পরকে বীজবপন করিতে দিও না। পরলোকে পুত্র যখন জনয়িতারই

হয় তখন যে এরূপে বীজ ব'ন করে সে বংশধারাকে ব্যর্থ অর্থাৎ ছিন্ন করিয়া দেয়—

অপ্রমত্তা রক্ষথ তন্তুমেতং
মা বঃ ক্ষেত্রে পরবীজানি বাপ্সুঃ
জনয়িতুঃ পুত্রো ভবতি সাম্পরায়ে
মোঘং বেত্তা কুরুতে তন্তুমেতমিতি। ঐ ২.২.৩৬

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রও বলেন, ব্রাহ্মণ বলেন পুত্র হইবে জনয়িতারই,—

উৎপাদয়িতুঃ পুত্র ইতি হি ব্রাহ্মণম্। ঐ ২.১৩.৬

এখানে উদাহরণস্বরূপে বৈদিক বাণী বলিতেছেন, এতদিন ভাবিতাম যখন স্ত্রী আমার, তখন তাহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রও আমারই। যখন বিচারে দেখা গেল পুত্র হইবে উৎপাদনকারীর তখন এতদিন পর্যন্ত স্ত্রীগণের পরপুরুষ-সংসর্গ সহিয়া থাকিলেও এখন আর আমি স্ত্রীগণের পরপুরুষ-সংসর্গ সহিতে পারিব না। কারণ ধর্মজ্ঞেরা বলিতেছেন, যমসাদনে পুত্র জনয়িতারই হইবে (উজ্জ্বলাকার হরদত্তকৃত ব্যাখ্যা)। মূল আপস্তম্ব বাণীও দেওয়া যাউক, অত্রাপ্যুদাহরন্তি।

ইদানীমেবাহং জনকঃ স্ত্রীণামীর্ষ্যামি নো পুরা।
যদা যমস্য সাদনে জনয়িতুঃ পুত্রমব্রুবন্। ঐ

তারপর বোধায়নের মতই আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রেও আছে—

রেতোধাঃ পুত্রং নয়তি। ঐ

এবং

অপ্রমত্তা রক্ষথ তন্তুমেতম্। ঐ

ইহাতে বুঝা যায়, বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও বহুকাল পরপুরুষসঙ্গমে কোনো বাধা স্ত্রীগণের ছিল না। জনক ঔপজঙ্ঘনি প্রভৃতি বহু ঋষি মুনিগণের বহুকাল ধরিয়া বহু চেষ্টায় সেইসব প্রথা ক্রমে সংযত হইয়া আসে। আজও তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই, কোনো দেশেই বা কোনো কালেই তাহা হয় না।

নঞ্জুন দায়্যা এবং অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার বলেন, বৃহস্পতি-স্মৃতিতেও এইরূপ শৈথিল্যের প্রাচীনতার কথা জানা যায়।[২৬]

ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৪. ৪. ১) ঋষি সত্যকামকে তাহার মাতা জবালা

২৬ বৃহস্পতি ২. ৩০ ; *Mysore Tribes and Castes*, vol. II, p. 361

বলিয়াছিলেন, কাহার ঔরসে তোমার জন্ম কেমন করিয়া বলি ; যৌবনে অনেকের পরিচারণায় তোমাকে পাইয়াছি—

বহ্বহং চরন্তী যৌবনে ত্বামলভে

বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে গৃহপরিবার সুব্যবস্থিত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আর্যদের মধ্যে পিতাই পরিবারের কর্তা (শতপথ-ব্রাহ্মণ, ২. ৫. ১. ১৮), মায়ের নাম তার পরে (ছান্দোগ্য-উপনিষদ ৭. ১৫.২)। পতি-পত্নীর সম্বন্ধের মধ্যেও পতির স্থান প্রধান। দ্রবিড় সভ্যতায় নারীদের প্রাধান্যের যতটা পরিচয় মেলে আর্য সভ্যতায় ততটা দেখা যায় না।

তখনকার দিনে সকলেই পুত্রকামনা করিতেন। তাই বৃহদারণ্যকের এইসব (১. ৪. ৮) বাণী, 'তাহা পুত্র হইতেও প্রিয়'—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" এবং "পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।" (ঐ ২. ৪. ৫) "কারণ আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ," "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" (শতপথ-ব্রাহ্মণ ১৪. ৯. ৪. ২৬)। বৃহদারণ্যকেও এই কথা ; সেখানে আরও দেখি, "প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে" (৪. ১. ৬)। ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলে ১৮৩ সূক্তে আগাগোড়াই পুত্রের মহত্ব ঘোষিত। ঋগ্বেদের ৫. ২৫. ৫ মন্ত্রে, অথর্বের ৬. ৮১. ৩ মন্ত্রে এবং আরও বহু বহু স্থলে পুত্রের জন্যই প্রার্থনা। পুত্রৈষণা বিত্তৈষণাই গৃহীর ধর্ম।

কন্যাকে দুহিতা বলে। কন্যাও স্নেহের ছিল, কিন্তু পুত্রের মত নহে। কন্যারা বাল্যে পিতার আশ্রিতা থাকিত। পিতার অভাবে ভাইয়ের আশ্রয় এবং বিবাহ হইলে পতির আশ্রয় মিলিত। ভাই না থাকিলে কন্যাদের যে বিবাহ হওয়া কঠিন ছিল সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পিতার অভাবে ভাইয়েরা ভগ্নীকে পালন করিত। সংসারে বাপের পরেই মা তাহার পর ভাই তাহার পর ভগ্নী। ছান্দোগ্যে (৭ ১৫. ২.) এইভাবেই পর-পর মহত্ব দেখা যায়। ভগ্নীকে স্বসা বলে। ভগিনী অর্থে ভাগ্যবতী, অথবা যে পিতার ধনের ভাগ পায়।

ঋগ্বেদে প্রায়ই বিবাহপ্রসঙ্গে নারী বলিয়া স্ত্রীলোকের উল্লেখ পাই।[২৭] বৈদিক কালে যৌবনেই বিবাহ হইত। কখনও কখনও কন্যার ভাই না থাকিলে বা অন্য কোনো দোষ থাকিলে পিতৃগৃহেই কন্যা জীর্ণ হইত, সেইরূপ কন্যাকে যে 'অমাজুর' বলিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অভিরূপ পতির

---

২৭ ঋগ্বেদ ১০. ১৮. ৭-৮. অথর্ব ১৪, ২, ১৩. ২০. ২১. ৬৩. ইত্যাদি

জন্য প্রার্থনায় বুঝা যায় যুবতী-বিবাহই চলিত ছিল। যখন কন্যা যুবতী, পতিলাভের জন্য তখন ব্যাকুলতা জাগিয়াছে। সূর্যার বিবাহের মন্ত্রগুলি (ঋগ্বেদ ১০.৮৫) দেখিলে বেশ বুঝা যায়, কন্যা রীতিমত যুবতী। সূত্র-যুগে অল্পবয়সে বিবাহের উল্লেখ আরম্ভ হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১. ১০. ১) 'আটিক্যা সহ জায়য়া' কথায় কেহ বলেন, উষস্তি চাক্রায়ণের স্ত্রীর নামই ছিল আটিকী; কেহ অর্থ করেন, 'অটনযোগ্যা' অর্থাৎ পর্যটন-সমর্থা; শঙ্কর বলেন, 'অনুপজাতপয়োধরাদি স্ত্রীব্যঞ্জনা'।

নারীদের অবরোধের কথা বেদে দেখা যায় না। সমাজে নারীরা সহজেই বিচরণ করিতেন, যাগযজ্ঞে যোগ দিতেন। নারীরা বেদমন্ত্রও রচনা করিতেন। অথর্বে নারীদের উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্যের কথা আছে, তাই বুঝা যায় নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিল। উপনিষদে ব্রহ্মবিদুষী নারীদের কথা পাই। নৃত্যগীতে নারীর শিক্ষা নিতে হইত (তৈত্তি-সং ৬. ১. ৬. ৫; মৈত্রা-সং ৩. ৭. ৩)। জাতিভেদপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বরকন্যার পছন্দ ও যৌবনবিবাহ চলিত। তাহার পর পছন্দ ও যৌবনবিবাহ গেল। স্মৃতির যুগে কন্যাদের অল্পবয়সেই বিবাহ হইত।

ভাই-ভগ্নীতে বিবাহ বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে তাহা নিন্দিত। গোভিল-গৃহ্যসূত্রে (৩. ৪. ৫) সগোত্রা কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রে (২. ৫. ১৫) দেখা যায়, সগোত্রকে কন্যা দিবে না, 'সগোত্রায় দুহিতরং ন প্রযচ্ছেৎ'। গৌতম-ধর্মসূত্রে (৪. ২) দেখি, অসমান-প্রবরের সঙ্গে বিবাহ হইবে। পিতৃবন্ধু হইতে সাতপুরুষ ছাড়াইলে এবং মাতৃবন্ধু হইতে পাঁচপুরুষ ছাড়াইলে বিবাহ চলে (৪.৩-৫)। মনু (৩.৫) বলেন, পিতার অসগোত্রা মাতার অসপিণ্ডা কন্যা প্রশস্ত। যাজ্ঞবল্ক্যের (১. ৫২-৫৩) মতও এই রকম। সবর্ণা-বিবাহ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনুলোম-রীতিতে অসবর্ণা-বিবাহ তখন রীতিমতই চলিত এবং তাহা শাস্ত্রসম্মতও ছিল। তবে দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রকন্যাকে বিবাহটা অনেকে পছন্দ করিতেন না বোধায়ন গৌতম ও উশনার মতে এইরূপ বিবাহে সন্তানেরা পিতার বর্ণই প্রাপ্ত হইত।

বর্ণশুদ্ধিরক্ষাপ্রয়াসী মনু যে অনুলোম-বিবাহের বিধান দিয়াছেন (২. ২৩৮; ৩. ১২-১৩) তাহার কারণ, তাহা ছিল সমাজপ্রচলিত, একদিনে তাহা উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। অনুলোম-বিবাহের সম্মতি গৌতম (৪. ১৬)

বোধায়ন (১. ১৬. ২-৫) এবং বসিষ্ঠ (১. ২৪-২৫) তাঁহাদের ধর্মসূত্রে দিয়াছেন। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রেও (১. ৪) সেই সম্মতি দেখা যায়। ব্যাস-সংহিতাও বলেন, উঢ়া অসবর্ণা পত্নীতে জাত সন্তান সবর্ণার গর্ভে জাত সন্তান হইতে হীন হয় না— ন স্ববর্ণাৎ প্রহীয়তে (২. ১০)।

সাধারণত লোকে একই পত্নী বিবাহ করিতেন। তবে একাধিক বিবাহও পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। মৈত্রায়ণী-সংহিতা বলেন, ধর্মশাস্ত্রব্যবস্থাপক মনুরই দশটি পত্নী ছিলেন। মনুপত্নীদের দশজনের মধ্যে একজন দশপুত্রা তার পর নবপুত্রা তার পর অষ্টপুত্রা সপ্তপুত্রা ষট্‌পুত্রা পঞ্চপুত্রা চতুষ্পুত্রা ত্রিপুত্রা দ্বিপুত্রা ও একপুত্রা ছিলেন—

'মনোর্বৈ দশজায়া আসন্ দশপুত্রা নবপুত্রা অষ্টপুত্রা সপ্তপুত্রা ষট্‌পুত্রা পঞ্চপুত্রা চতুষ্পুত্রা ত্রিপুত্রা দ্বিপুত্রা একপুত্রা' (১. ৫. ৮)। তবেই মনুর দশপত্নীর পঞ্চান্নটি পুত্র ছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণেও (৯. ১. ৪. ৬) এই প্রথার বৈধতা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজাদের প্রায়ই চারিটি স্ত্রীর উল্লেখ দেখা যায়। প্রথমা হইলেন মহিষী। তার পর পরিবৃক্তী বা 'দুয়ো'রানী, হয়তো সন্তান না হওয়ায় তিনি উপেক্ষিতা। তার পর বাবাতা বা 'সুয়ো'। তার পর পালাগলী, ইনি রাজার কোনো অনুচরের কন্যা। এইসব কথা নানাস্থানের উল্লেখসহ Macdonell এবং Keithএর *Vedic Index* গ্রন্থে (*vol. 1. p. 478*) ভালো করিয়া লিখিত আছে। নারীর একসঙ্গে বহুপতির প্রথা বেদে দেখা যায় না। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ ছিল। তবে আইনে বিধান না থাকিলেও কোথাও কোথাও যে বিধির ব্যতিক্রম হইত, তাহা দেখাই যায়। আর তাহা কোন্ দেশে অথবা কোন্ কালেই বা না দেখা যায়?

প্রাচীন কালে যখন বরকন্যা পরস্পরকে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেন তখন টাকা-পয়সার প্রশ্ন উঠিতই না। তার পর কোথাও কোথাও পণ দিয়া কন্যাসংগ্রহ করিতে হইত।[২৮]

মনুও (৩. ৫৩) ইহার উল্লেখ করেন, কিন্তু অনুমোদন করেন না। তবে বরপক্ষ যাহা দেন তাহা যদি পিতৃকুলে গৃহীত না হইয়া কন্যাকেই দেওয়া হয় তবে তাহাতে বিক্রয় হয় না (৩. ৫৪)। কন্যাবিক্রয়কে মনু নিন্দা করিয়াছেন।

২৮ তৈত্তিরীয়-সংহিতা ২. ৩. ৪. ১ ; কাঠক-সংহিতা ৩৬. ৫ ; মৈত্রায়ণী-সংহিতা ১. ১০. ১১ তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ১, ১. ২. ৪

বরপক্ষ স্নেহ বা শ্রদ্ধাবশতঃ যাহা কন্যাকে দেন তাহাতে দোষ নাই (৩, ৫৪-৫৫)। এইসব বিষয়ে মধ্যেমধ্যে জামাতা ও বরপক্ষের কার্পণ্যও নিন্দিত হইয়াছে। তবে অঙ্গহীনা কুশ্রী কন্যার বিবাহে বরকে অর্থ দিয়াই বিবাহে সম্মত করিতে হইত (ঋগ্বেদ ১০. ২৭. ১১)। সুন্দরী কন্যা সবাই চাহিত, তাহার উপর কন্যা যদি ভালো হয় তবে তো কথাই নাই (ঐ ১০. ২৭. ১২)। সুন্দরী না হইলে ভগ্নীকে টাকা দিয়া ভাইরা বিবাহ দিতেন (ঐ ১. ১০৯. ২)। কন্যার বিবাহের সঙ্গে 'অনুদেয়ী' কথাটি ঋগ্বেদে (১০. ৮৫. ৬) পাওয়া যায়। সায়ণ অর্থ করেন, মেয়ের মন প্রসন্ন রাখিবার জন্য তার সঙ্গে দীয়মানা বয়স্যা ("বধূবিনোদায় অনুদীয়মানা বয়স্যা")। কেহ কেহ অর্থ করেন, কিছু পণ।[২৯]

বিবাহ-অনুষ্ঠান

বৈদিক যুগেও বিবাহ-অনুষ্ঠানে ঘটা করিয়া নানারকমের আচার প্রতিপালিত হইত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৮৫ সূক্তটির বিষয় হইল সূর্যার বিবাহ। এই সূক্তটি বেশ দীর্ঘ, কারণ ইহাতে ৪৭টি ঋক্ আছে। অথর্ববেদেরও চতুর্দশ কাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সূক্ত সূর্যার বিবাহ লইয়া। তবে তাহা আরও বিশদভাবে বর্ণিত। কারণ, প্রথম সূক্তে আছে ৬৪টি মন্ত্র এবং দ্বিতীয়সূক্তে আছে ৭৫টি। তবেই মোট হইল ১৩৯টি মন্ত্র। তাহার পরে গৃহ্যসূত্রগুলিতেও বিবাহপদ্ধতিটি সবিস্তারে বর্ণিত। অনেকে মনে করেন, বৈদিক বিবাহপদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীন য়ুরোপীয় আর্যদেরও বিবাহপদ্ধতির মিল কিছুকিছু আছে।

বিবাহে বরপক্ষ কন্যার বাপের বাড়ি আসিতেন। সেখানেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। বরপক্ষীয়দের জন্য ঘটা করিয়া উৎসবের আয়াজন হইত। উৎসবে গোহত্যা করা হইত।

সূর্যার বিবাহ-মন্ত্রে আছে, সূর্যার বিবাহে সূর্য যে উপহার পাঠাইয়াছেন তাহা আগেই রওয়ানা হইয়া চলিল। মঘাতে যে গোহত্যা করা হয় পূর্ব ও উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে তাহা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়—

> সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
> অঘাসু হন্যংতে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে ॥ ঋগ্বেদ ১০. ৮৫. ১৩

একসময় গোহত্যার এত প্রচলন ছিল যে গোহত্যার জন্য বিশেষ স্থানও নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে অনেক গো নিহত হইত (ঐ ১০. ৮৯. ১৪)।

---

২৯ Whitney's *Translation of the Atharva Veda Samhita*. 14. 1.7

এখনও বিবাহে সেই গবালম্ভের একটু অবশেষমন্ত্র উচ্চারিত হয়। বিবাহ-কালে নাপিত আসিয়া বলে "গৌর্গৌঃ" অর্থাৎ "অনুষ্ঠানে হন্তব্য গো যে এই রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি করা যায়?" তখন বর বলিবেন—

ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্ দ্বিষন্তং মেঽভিধেহীতিতং

জহ্যমুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গামত্তু তৃণানিপিবতূদকমিতি ক্রূয়াৎ। গোভিলীয়-গৃহ্য ৪. ১০.১৯

অর্থাৎ "এই গোকে বরুণপাশ হইতে মুক্ত কর। যজমানের এবং আমার উভয়ের অনুমতিতে ইহাকে ছাড়িয়া দাও, গোবধকারীকেও যাইতে বল। এই গো এখন তৃণ খাউক, জলপান করুক।"

এইমন্ত্রটি সামমন্ত্র-ব্রাহ্মণে (২. ৮. ১৩) এবং খাদির-গৃহ্যসূত্রেও আছে (৪. ৪. ১৭)। সামমন্ত্র-ব্রাহ্মণ গ্রন্থখানি পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহাতে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দেওয়া আছে।

"গৌর্গৌঃ" শব্দ নাপিত উচ্চারণ করিলে প্রথমে পূর্বোক্ত মন্ত্রটি বলিয়া তাহার পর বরকে বলিতে হয়,—

ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং
স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়
মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ঋগ্বেদ ৮. ১০১. ১৫

অর্থাৎ "এই গাভী হইলেন রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগ্নী, অমৃতের আবাসস্থান, সেই নির্দোষ মুক্ত গোকে বধ করিও না; এইকথা চেতনান্বিত লোকদের কহিয়াছিলাম।"

এই শেষোক্ত ঋকের ঋষি হইলেন ভার্গব জমদগ্নি।

পুরোহিতের দ্বারা এই দুইটি মন্ত্র উচ্চারণের পর এখনকার দিনে নাপিত চলিয়া যায়, এবং তাহার পর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসাধন করিয়া সম্প্রদাতা বর ও কন্যা সকলেই নারায়ণকে প্রণাম করেন। তার পর এখন বরকন্যাকে বাসরঘরে লইয়া যাওয়া হয়।[৩০] বিবাহে নাপিতেরা এখন যে "গৌর্গৌর্" কেন বলে তাহা তাহারা নিজেরাও জানে না। তাহারা মনে করে ইহা 'গৌরবচন'। কোথাও তাই বিবাহের সভায় নাপিত 'গৌর'স্তুতি কোথাও

৩০ সামবেদীয় বিবাহসংস্কার, পৃ ৪০৮; পুরোহিত দর্পণ, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত অষ্টম সংস্করণ।

বা হর-গৌরীর প্রণতিসূচক বাংলা দু-চারটি ছড়া কবিতা উচ্চারণ করে। বৈদিক মন্ত্রটির কথাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। এই মন্ত্রটির অর্থ ও উদ্দেশ্য এখন আর কে-বা যত্নপূর্বক দেখিবেন ?

এই মন্ত্র উচ্চারণে দেখা যায় একসময়ে বিবাহে আর্যদের মধ্যে গবালম্ভ ছিল, তাহা ক্রমে চারিদিকের অহিংসা-সমর্থক মতবাদের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে অহিংস হইয়া পড়িল। তাই ইহার প্রথমমন্ত্র বেদের উত্তরভাগের। অহিংসা-সূচক দ্বিতীয় মন্ত্রটি প্রাচীন সংহিতা হইতেই সংগৃহীত। অহিংসা প্রচার করিবার জন্যই বেদবাহ্য জৈন বৌদ্ধাদি মতের উৎপত্তি।

আর্যদের ক্রিয়াকাণ্ড, পারিবারিক কৃত্য ক্রমেই এইরূপে অহিংস হইতে লাগিল। জৈন বৌদ্ধাদি মতের সংস্পর্শে ক্রমে সামাজিক জীবনে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের আদর্শ আসিতে লাগিল। চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ-আশ্রম মোটে একপাদ অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ হইয়া দাঁড়াইল। বাকি তিনপাদই সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচর্য। বিধবাদের মধ্যে পুনর্বিবাহের স্থলে ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন পুরুষেরা চারি আশ্রমের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বিধবার উপর সারাজীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্যটি ঠিক তেমনি চাপানো আছে। ব্রত উপবাসাদিও সবই এখন বিধবার কৃত্য। এইগুলি বিধবাদের প্রকরণে আবার আলোচিত হইবে।

এখন যে প্রসঙ্গ চলিতেছে তাহাতেই আসা যাউক, অর্থাৎ প্রাচীন কালের বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথাই চলুক। কন্যাকে শয্যা-আভরণ প্রভৃতি উপহার সাজাইয়া দেওয়া হইত (ঋগ্বেদ ১০. ৮৫. ৭)। বিবাহের রথটি সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করা হইত এবং তাহা পুষ্পে পল্লবে সাজানো হইত। (ঐ ১০. ৮৫. ১৩; ঐ, ২০)। ঋগ্বেদের সূর্যা-বিবাহ দেখিলে বুঝা যায়, পতিকুলে কন্যা যাহাতে ধ্রুব হয় তাহা প্রার্থনা করিয়া মন্ত্রপাঠ হইত। কন্যাকে তাই ধ্রুব প্রতিষ্ঠা স্বরূপ শিলাতে আরোহণ করাইয়া পতি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া হোমাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিতেন।

বিবাহের প্রধান তিনটি অঙ্গ। সেই সবই অবশ্য বরকন্যার পরস্পরকে বরণ করিবার পর অনুষ্ঠিত হইত। 'একত্র গমন'— তাহা হয় সপ্তপদীতে, স্বামীর গৃহের অগ্নিতে 'একত্রে যজন' (যজ্ঞ), ও পতিগৃহের সকলের সঙ্গে 'একত্রে ভোজন' (বৌভাত)। বিবাহে উভয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ, দীর্ঘজীবন, সৌভাগ্য এবং

পুত্র-পৌত্রাদিই কাম্য ছিল। ধনজনবৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হইত। তবে বিবাহানুষ্ঠানের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কথাই হইল বরণ (নারদীয়-মনুসংহিতা ১২. ২)। তার পরই হইল একত্রে গমন-যজন-ভোজন। এই তিনটিই বিবাহানুষ্ঠানের মুখ্য অঙ্গ।

অথর্বে সূর্যার বিবাহের আদিতেই সত্যে ও বিশ্বে ও দেবতার মধ্যে বিবাহের প্রতিষ্ঠামন্ত্র দেখা যায়। পূর্বকৃত কোনো দুর্নীতি যদি থাকে তবে তাহা হইতে মুক্তির জন্য বরুণের কাছে নিষ্কৃতি প্রার্থিত হয় (১৪. ১. ১৯)। স্বামীর পক্ষে কন্যা যাহাতে বরের 'স্যোনা' বা আনন্দদায়িনী হয় তাহাই সকলে চাহিতেন। পতির গৃহে যাহাতে কন্যা গিয়া 'পত্নী' হইতে পারে (১৪. ১. ২০), গার্হপত্য ধর্মে সদা জাগ্রত থাকে (১৪. ১. ২১), দীর্ঘজীবী হইয়া পুত্রপৌত্র সহ সুখী হইতে পারে (১৪. ১. ২২) তাহাই প্রার্থনা করা হইত। নিত্য যেন উভয়ের কাছে উভয়ে নবীন হইতে থাকে (১৪. ১. ২৪)। বিচ্ছেদ বা মতান্তর না ঘটে (১৪. ১. ৩২), পত্নী যেন দীপ্ত গৌরবে শোভমানা হয় (১৪. ১. ৩৫-৬), সমস্ত প্রকৃতি যেন বধূর কল্যাণকারিণী হয় (১৪. ১. ৪০), ইহাই আশীর্ব্বাদ করা হইত। দাক্ষিণ্যে ও উদারতায় পতিগৃহে গিয়া যেন কন্যা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় গৌরবান্বিতা হয়, ইহা কামনা করা হইত (১০. ১. ৪৩-৪৪)। পতিও সৌভাগ্যকল্যাণ কামনা করিয়া পত্নীর হস্ত গ্রহণ করিতেন (১৪. ১. ৫০)। পতি বলিতেন, "আমি তোমাকে নীতির দেবতা বরুণের পাশ হইতে মুক্ত করিলাম (১৪. ১. ৫৮)। হে সুন্দরি, পুষ্পশোভিত সুকিংশুক বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত, হিরণ্যবর্ণ, সুবৃত সুচক্ররথে আরোহণ করিয়া পতির পক্ষে এই রথকে আনন্দময় করিয়া অমৃতলোকে যাত্রারম্ভ কর (১. ১৪. ৬১)। সর্বদিকে ব্রহ্মপরিবৃত হইয়া, হে কল্যাণি, আনন্দময়ি, তুমি দেবপুরে গিয়া পতিলোকে বিরাজমানা হও (১৪. ১. ৬৪)।"

দ্বিতীয় সূক্তে ৭৫টি মন্ত্র। তাহাতে প্রধানত অকল্যাণ দূর করিয়া নানা সৌভাগ্য কামনা করা হইয়াছে: "বিধাতা এই নারীকে এই সংসার দিয়াছেন, সে এখানে কল্যাণী হউক (১৪. ২. ১৩)। বিষ্ণুর সরস্বতীর মত এখানে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও, তুমি বিরাট হও (১৪. ২. ১৫)। সকলের আনন্দ ও কল্যাণ বিধান কর, পতির কল্যাণকারিণী হও (১৪. ২. ১৭-১৮)। গার্হপত্য অগ্নি, পিতৃগণ ও সরস্বতীকে (২৬-২৭) নমস্কার কর (১৪. ২. ২০)। বিদায় লইবার

পূর্বে সমবেত সকলে এই সুমঙ্গলী নববধূকে আশীর্বাদ করুন (১৪. ২. ২৮)। হে নববধূ, আজ হইতে ইন্দ্রাণীর ন্যায় উষার ন্যায় শোভমানা হও, নবচেতনায় সকলকে জাগ্রত কর (১৪. ২. ২১)।

"এইসব তরুণীরা যখন আনন্দিত মনে, আগ্রহে পতির গৃহে যাত্রা করে তখন আমরাও বলি 'স্বাহা' (১৪. ২. ৫২), অর্থাৎ 'ভালো-ভালো'। সর্বযশ সর্বরস ইহাতে প্রবেশ করুক (১৪. ২. ৫৮)। এই কন্যাও লাজ-শস্য ছড়াইয়া পতিকুলের শুভ কামনা করে (১৪. ২. ৬৩)। হে কন্যা, গৃহের পত্নী হইয়া গৃহে গমন কর, শতজীবিনী হও, সবিতা তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন (১৪. ২. ৭৫)।"

গৃহ্যসূত্র ও পরবর্তী স্মৃতি এবং নিবন্ধগুলির মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবাহপ্রথা যেরূপ বিপুল হইয়া উঠিল তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা সহজেই দেখিতে পারেন। তাহার পর দেশাচার কুলাচার ভেদে স্ত্রীগণের নানা আচার-অনুষ্ঠানে বিবাহ একটা বিরাট মহোৎসবে পরিণত হইল।

বেদে 'সপত্নী' শব্দ আছে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে প্রথম ও ষষ্ঠ সূক্তে এবং আরও নানা স্থানে সপত্নী কথাটি দেখা যায়। ইহাতে সেইখানে একাধিক পত্নীর উল্লেখ থাকিলেও সাধারণ একপত্নী থাকাই প্রথা ছিল, যদিও মনুর দশ ও যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন। রাজারা একাধিক বিবাহ করিতেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য দেখিলে ইহাই মনে হয়, একপত্নী লইয়াই সাধারণত সকলেই ঘর করিতেন। এক স্ত্রীর বহুপতি থাকা আর্যেতর জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও আর্যদের মধ্যে তাহা চলিত ছিল না। সূর্যার বিবাহ-বিষয়ে যে 'পতিভ্যো জায়াং' কথা আছে এখানে পতিকুল সম্বন্ধে অথবা সম্মানে বহুবচন করা হইয়াছে। অথর্ব বেদের (১৪. ১. ৬১) "স্যোনং পতিভ্যো বহতুং কৃণুত্বম্" অর্থাৎ পতিকুলের জন্য এই রথযাত্রাকে আনন্দময় কর।

সূর্যার বিবাহপ্রসঙ্গেই একটি কথা আছে, "তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ"— এই মানুষ তোমার চতুর্থপতি (ঋগ্বেদ. ১০. ৮৫. ৪০)। ইহাতে কেহ যেন ভুল না বোঝেন। কারণ পূর্ণমন্ত্রটি এই—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টেপতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ।

অর্থাৎ, প্রথমে তোমাকে পাইয়াছেন সোমদেবতা; তাহার পর তোমাকে পাইলেন গন্ধর্ব; অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি; চতুর্থ পতি হইলেন এই মনুষ্যবর।

ইহার পরের মন্ত্রটি এই—

সোমো দদদ্ গন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে। ১০, ৮৫, ৪১

সোম ইহাকে দিলেন গন্ধর্বকে, গন্ধর্ব দিলেন অগ্নিকে।

এখানে দেবতার সঙ্গে কন্যার বিবাহ যে কোনো মতেই হইতে পারে না তাহা সকলেই বোঝেন। তবে এইকথা বলিবার আসল তাৎপর্য কি? গোভিলীয়-গৃহ্যসূত্র-পরিশিষ্টে দেখা যায় (২. ১৭-২০) ঋতুমতী না হইতে কন্যাকে বলে 'নগ্নিকা'; ঋতুমতী হইলে 'অনগ্নিকা', এই অনগ্নিকা কন্যাই বিবাহে দান করিতে হয়। নগ্নিকাকে 'গৌরী' এবং ঋতুমতী অনগ্নিকাকে 'রোহিণী'ও বলে। যৌবনচিহ্ন দেখা না গেলে 'কন্যা', কুচাদিহীনাকেও 'নগ্নিকা' বলে। যৌবনব্যঞ্জন দেখা গেলে সোম সেই কন্যাকে গ্রহণ করেন (অর্থাৎ তখন সে সৌম্য হয়), পয়োধর হইলে গন্ধর্ব গ্রহণ করেন এবং ঋতুমতী হইলে অগ্নি তাহাকে গ্রহণ করেন। তাই অব্যঞ্জনোপেতা, অরজা, অপয়োধরা কন্যকাদান ভালো নয়, কারণ বেদে-উক্ত দেবতাদের সঙ্গে তাহার তখনও কোনো যোগ হয় নাই—

তস্মাদব্যঞ্জনোপেতামরজামপয়োধরাম্।

অভুক্তাং চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকাং ন প্রশস্যতে।

এইসব দেবতাদের সঙ্গে যোগের ও ভোগের কথা যে অর্থবাদমাত্র তাহা বুঝা যায় বসিষ্ঠস্মৃতির এই শ্লোক দেখিয়া—

পূর্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ববহ্নিভিঃ।[৩১]

অর্থাৎ, পূর্বে স্ত্রীগণ সোম গন্ধর্ব বহ্নির দ্বারা ভুক্ত। ইহার তাৎপর্যও পরশ্লোকেই তিনি বলিতেছেন, সোমদেবতা নারীকে দেন শুচিতা, গন্ধর্ব দেন শিক্ষিত বাণী, অগ্নি দেন সর্বভক্ষত্ব, তাই নারীগণ নিষ্কল্মষ—

তাসাং সোমোঽদদচ্ছৌচং গন্ধর্বঃ শিক্ষিতাং গিরম্।

অগ্নিশ্চ সর্বভক্ষত্বং তস্মান্নিষ্কল্মষাঃ স্ত্রিয়ঃ। ২৮. ৬

বৌধায়নও এইকথা বলেন (বৌধায়ন-স্মৃতি, ২. ২. ৫৮)।

মহর্ষি অত্রি বলেন—

পূর্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ববহ্নিভিঃ।

ভুঞ্জন্তে মানবাঃ পশ্চান্ ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।[৩২]

---

৩১ স্মৃতীনাং সমুচ্চয় সংস্করণে, বসিষ্ঠস্মৃতি, আনন্দাশ্রম ২৮. ৫

৩২ অত্রিসংহিতা, মন্মথনাথ দত্ত সংহিতা, ৯০

সোম গন্ধর্ব বহ্নির পরে মানব স্ত্রীকে ভোগ করেন, ইহাকে কেহ দোষ দিতে পারে না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিলেন, সোম কন্যাকে দিলেন শৌচ, গন্ধর্বেরা দিলেন শুভা বাণী, পাবক দিলেন সর্বমেধ্যতা, তাই তো নারীগণ সর্বদাই পবিত্র—

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতোহ্যতঃ। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ১. ৭১

কাজেই এইসব মন্ত্র দেখিয়া বুঝা যায় কন্যাদের বহু-পতিত্ব ইহাতে বুঝায় না। তবে কন্যাদের বহু-পতিত্ব যে একেবারে ছিল না তাহা নহে, সেকথা পরে হইবে।

এই বিচারে দেখা গেল, তখন যৌবনেই বিবাহ হইত।

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রে (২. ১. ১৭) দেখা যায়, ঋতুমতী না হইলে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করিবে না। গৌতম ধর্মসূত্রেও (৫. ১) সেই উপদেশ। প্রাচীন কালে কথার কথাই ছিল—

প্রাগ্‌রজোদর্শনাৎ পত্নীং নেয়াৎ।

অর্থাৎ, পত্নীকে রজোদর্শনের পূর্বে গমন করিবে না। গোভিলীয়-গৃহ্যসূত্রাদি গ্রন্থে এই বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ আছে। অথচ বিবাহের পরই গর্ভাধান করিবার জন্য অন্ততঃ কয়টি দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে তাহারও বিধান সেইসব গৃহ্যসূত্রে আছে। তিনরাত্রি উভয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গর্ভাধান করিবে, ইহাই গোভিলীয়-গৃহ্যসূত্রের ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থার মূল ছিল বীর ও তপস্যাশীল পুত্রলাভের বাসনা। অবশ্য এই বিষয়ে এখন Eugenics শাস্ত্রবিদ্‌দের কি মত তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আশ্বলায়ন বলেন—

অত ঊর্ধ্বমক্ষারলবণাশিনাবধঃশায়িনৌ ব্রহ্মচারিণৌ স্যাতাম্। ত্রিরাত্রং
দ্বাদশরাত্রং সংবৎসরংবৈক ঋষির্জায়ত ইতি। আশ্বলায়ন-গৃহ্য ১. ৮. ১১

অর্থাৎ, বিবাহের পর তখনই গর্ভাধান না করিয়া অন্তত কয়েকদিন উভয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করিবে। ভোজনে ক্ষার-লবণ ত্যাগ করিয়া খাট-পালঙ্কে না শুইয়া সংযত ব্রহ্মচর্যব্রতধারী হইয়া স্বামী স্ত্রী উভয়ে থাকিবে। কাহারও কাহারও মতে তিনরাত্রি থাকিলেই চলে, কেহ বলেন দ্বাদশরাত্রি, কেহ বলেন পুরা এক বৎসর এই ব্রত পালনীয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল সন্তান যেন একজন ঋষি হয়।

এখানে বৃত্তিকার হরদত্তাচার্য বলেন, এইরূপ নিয়মে থাকিলে ঋষিকল্প সন্তান হয়—

এবং নিয়মযুক্তস্ত ঋষিকল্পঃ পুত্রো জায়তে।

গণপতি শাস্ত্রীর মতে হরদত্ত খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার বৃত্তির নাম 'অনাবিলা'।

গোভিলীয়-গৃহ্যসূত্রেও দেখা যায়—

তাবুভৌ তৎপ্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ ভূমৌ সহ শয়ীয়াতাম্। ২,৩, ১৫

অর্থাৎ, বিবাহকর্মারম্ভের পর বরকন্যা উভয়ে কিছু কাল ভোজনে ক্ষার-লবণ বর্জন করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া একসঙ্গে ভূমিশয্যায় শয়ন করিবে।

ভাষ্যকার চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার মহাশয় বলেন, এখানে ব্রহ্মচর্যের অভিপ্রায় হইল সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তিন রাত্রি কাটাইতে হইবে।

তিনরাত্রির পরই সম্ভবকাল, এইকথা কোনো কোনো আচার্য বলেন—

ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রাৎ সম্ভব ইত্যেকে। গোভিলীয়-গৃহ্য ২. ৫. ৭

কোনো-কোনো আচার্যের মতে যখন ঋতু নিবৃত্ত হয় তখন সম্ভবকাল—

যদর্ত্তুমতী ভবত্যুপরতশোণিতা তদা সম্ভবকালঃ। ঐ ২, ৫, ৮

ইহাতেই বুঝা যায় বিবাহের পরই সম্ভোগ চলিত। তবে সুসন্তান লাভের জন্য কয়েকদিন ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গর্ভাধান করার বিধান আচার্যেরা দিয়াছেন।

অপ্রাপ্তযৌবনা নারীর সঙ্গে উপহাসও করিবেনা— এইরূপ কঠিন অনুশাসন ছিল—

নাজাতলোম্ন্যোপহাসমিচ্ছেৎ। ঐ ৩. ৫. ৩

এইসব বাক্যে বুঝা যায় তখন কন্যা রীতিমত বড়ই হইত। ভাষ্যকার চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার বলেন, বৈদেহরীতিতে যে সদ্য স্ত্রীপুরুষ সম্ভোগ দেখা যায়, তাহাই এই ব্রহ্মচর্যবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইতেছে—

বৈদেহেষু চ সদ্য এব ব্যবায়ো দৃষ্টঃ।

সোঽয়মিদানীং প্রতিষিধ্যতে। ঐ ২. ৩. ১৫ ভাষ্য

এখন অর্থাৎ পরবর্তীকালে অতি অল্পবয়সে কন্যাদের বিবাহ হওয়ায় বিবাহান্তে যখন বধূর রজোদর্শন হয়, তখন দ্বিতীয় বিবাহ বলিয়া একটি আচার পালিত হয়। ইদানীং আবার শিক্ষিত সমাজে কন্যাদের বেশি বয়সে বিবাহ হইতেছে বলিয়া দ্বিতীয় বিবাহের অনুষ্ঠান বহুস্থানে প্রায় লোপ পাইয়া

আসিতেছে। কিন্তু আমরা বাল্যকালে এই আচার পল্লীগ্রামে পালিত হইতে দেখিয়াছি।

সেই দ্বিতীয় বিবাহ সময়ে একটা ব্রহ্মচর্যের অভিনয় করা হইত। অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভিক্ষায় সংগ্রহ করিয়া ক্ষার-লবণ বিনা কন্যাকে খাইতে হইত। এই ভিক্ষাকে 'মাঙ্গন' বলিত। এখনকার দিনে যেমন ব্রহ্মচারীরা শূদ্রমুখ দেখার ভয়ে অন্ধকার ঘরে কিছুকাল বদ্ধ থাকিয়া কল্পনাতে আশ্রমবাস ফললাভ করে, দ্বিতীয় বিবাহে বধূরাও সেইরূপ করিত ; কারণ তাহারাও তখন ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছে। এখন ইহার কতটা কোথায় পালিত হইতেছে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। পল্লীগ্রামে এই রীতি কতকটা এখনও পালিত হয়।

এই দ্বিতীয় বিবাহের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের যেসব আচার ও গান প্রভৃতি ছিল তাহা শ্লীলতার সীমাবহির্ভূত। তবে তাহাতেও বিবাহকালীন কিছু আচার পালিত হয়। ইহাতে মনে হয়, পূর্বে এই বিবাহই মুখ্য বিবাহ ছিল।

এখন যে বিবাহের পরের রাত্রিটি 'কালরাত্রি' নামে অভিহিত তাহাতে যে বরকন্যার যোগ ঘটিতে দেওয়া হয় না, তাহা কি এই ব্রহ্মচর্যেরই অবশেষ? পূর্ব-ইতিহাস বিস্মৃত হওয়ায় এখন কেহ কেহ বলেন, কালরাত্রিতে বেহুলার সঙ্গে থাকায় লখিন্দর সর্পদংশনে মারা যায়, তাই এই নিষেধ।

যৌবনে কন্যাদের বিবাহ হইলে একটা মুশকিল এই হইতে পারে যে, বিবাহকালে হোমাগ্নির সম্মুখে যদি কন্যা রজস্বলা হয় তখন কি করা যায়? কারণ রজস্বলা অবস্থায় নারী তো যজ্ঞে যোগ দিতে পারেন না। তাহার প্রতিবিধানার্থ আপস্তম্ব প্রথমে এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—

বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে যদা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যা সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ। ৭. ৯

অর্থাৎ, বিবাহের যজ্ঞ যখন বিস্তৃতভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে, যখন সংস্কার করা হইতেছে, তখন যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে সংস্কার সমাপ্ত হইবে কেমন করিয়া?

তাহার উত্তরে আপস্তম্ব নিজেই বলিতেছেন, কন্যাকে তখন স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রাদির দ্বারা শোভিত করিয়া পুনরায় আহুতি দিয়া বাকি কর্ম সমাপ্ত করিবে—

স্নাপয়িত্বা তদা কন্যামন্যৈর্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
পুনঃ প্রত্যাহুতিং হুত্বা শেষং কর্ম সমাচরেৎ। আপস্তম্ব-স্মৃতি ৭. ১০

এইরূপ বিবাহযজ্ঞে রজোদর্শনে কি করা উচিত তাহা শাস্ত্রের আরও বহু স্থানে বিবৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা আর দেওয়া হইল না।

সম্পত্তির অধিকার

কন্যাকে দান ও যৌতকাদি যে দেওয়া হইত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তবে সংসারে পত্নীর স্থান কেমন ছিল তাহা বলা একটু কঠিন। আদর্শ তখনকার দিনে খুবই উচ্চ ছিল। কারণ কন্যাকে পতিগৃহে গিয়া সম্রাজ্ঞী হইতে হইবে, এই আশীর্বাদ বেদের বহুস্থলেই আছে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, তখনকার আইনে কিরূপ বিধান দেখা যায়। পিতৃগৃহ হইতে প্রাপ্ত ধন এবং পতি যাহা স্ত্রীকে বিশেষ করিয়া দিতেন তাহা হইল স্ত্রীধন। এই স্ত্রীধনে নারীর নিজস্ব অধিকার ছিল। আর্যেরা যখন আর্যকন্যাই বিবাহ করিতেন তখন নারীদের অবস্থা উন্নততর ছিল। কিন্তু যখন তাঁহাদের মধ্যে শূদ্রা-পত্নী গ্রহণ বেশি করিয়া চলিল তখন ক্রমে সেই সম্মান আর রহিল না।

শতপথ-ব্রাহ্মণে যে আছে নারীদের নিজের বা সম্পত্তির উপর অধিকার নাই (৪. ৪. ২. ১৩) তাহা সেই জাতীয় কথা। মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (৪. ৬. ৪) ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায়ও (৬. ৫. ৮. ২) অনুরূপ কথা দেখা যায়।

বিবাহকালে অগ্নির সমক্ষে পিতৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত তাহা 'অধ্যগ্নি'। পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে যাইবার সময় প্রাপ্ত ধনকে বলে 'অধ্যাবাহনিক' (কুল্লূকভট্ট)। মনু বলেন, অধ্যগ্নি অধ্যাবাহনিক প্রীতিবশত পতির কাছে প্রাপ্ত ভাইয়ের কাছে মায়ের কাছে বাপের কাছে প্রাপ্ত এই ছয় প্রকারে প্রাপ্ত ধনই স্ত্রীধন—

> অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তং চ প্রীতিকর্মণি।
> ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্‌। মনু ৯, ১৯৪

নারদীয়-মনুসংহিতাতেও (১৩.৮) এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যেও (৮.৩-১৪৪) এই বিধানই দেখা যায়।[৩৩]

বরদরাজ-কৃত ব্যবহার-নির্ণয়ে দেখা যায়, নারদ ও বিষ্ণুর সেই মত। সেইখানে দেবলের ও কাত্যায়নের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে।[৩৪]

---

৩৩ Adyar Series, 29

৩৪ দায়বিভাগ কাণ্ড। পৃ ৪৬৪

মহাভারতে দেখা যায়, নারীরা বিবাহকালে শ্বশুরাদি গুরুজনের কাছে প্রীতি-উপহার বা প্রীতিদায়স্বরূপে ধনরত্নাদি লাভ করিতেন। তখন কন্যাদের আদর ছিল—

শ্বশুরাৎ প্রীতিদায়ং তৎ প্রাপ্য সা প্রীতমানসা। অশ্বমেধ, ৮৯. ২৯

এই ধন যৌতক স্বরূপে গণনীয়। কন্যাপক্ষীয়রাও বরপক্ষের বাড়ি গেলে বরপক্ষের কাছে রত্নাদি উপহার পাইয়া ফিরিতেন—

রত্নান্যাদায় শুভ্রাণি দত্তানি কুরুসত্তমৈঃ। আদি ২২১. ৬২

বৈদিকযুগে স্ত্রীধনরূপে নারীরা কি পাইতেন তাহা আলোচনা করিতে গেলে তখনকার দিনের বেশভূষা ও অলংকারাদির বিষয় আলোচনা করিতে হয়। এই বিষয় অধ্যাপক Macdonell এবং Keith তাঁহাদের সম্পাদিত *Vedic Index*-এ ভালোরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'নীবি' অর্থ মেয়েদের অন্তর্বাস। অথর্বে ইহা উল্লিখিত। ঋগ্বেদে 'পেশস্' পাওয়া যায়, তাহা জরির কারুকার্যময় বস্ত্র। বাঈজীদের 'পেশোয়াজে'র সঙ্গে কি ইহার কোনো মিল আছে? বধূ যে বস্ত্র পরিয়া বিবাহের সভায় আসিতেন তাহার নাম 'বাধূয়' (ঋগ্বেদ ১০. ৮৫. ৩৪)। এই সুন্দর বস্ত্রখানি পরে কোনো ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইত। কাপড়ের সুন্দর পাড় থাকিত। তাহাকে 'সিচ্' বলিত (ঋগ্বেদ ১০. ১৮. ১১)। খুব জমকালো পোশাক অর্থে 'সুবসন' শব্দ পাই (ঋগ্বেদ ৫. ৫১. ৪)।

বসনের পরই আভূষণ অলংকার। ঋগ্বেদে সূর্যার বিবাহপ্রসঙ্গে কিছু বেশভূষা উপকরণের নাম দেখা যায়। 'ওপশ' জিনিসটা কি? ঋগ্বেদে (১০. ৮৫. ৮) ইহার উল্লেখ দেখি। সায়ণ বলেন, "যেন উপশেরতে"। কেহ মনে করেন বেণি বা চূড়া, কেহ বা বুঝেন শিরোভূষণ বিশেষ। 'কর্ণশোভনা'কে (ঋগ্বেদ ৮. ৭৮. ৩) সায়ণ মনে করেন কর্ণাভরণ। অথর্ববেদের (৬. ১৩৮. ৩) 'কুম্ব' ও 'কুরীর' দেখা যায়। হয়তো তাহা শৃঙ্গনির্মিত চিরুণি (comb?) বা বিশেষ প্রকারের কেশসজ্জা। 'খাদি' (ঋগ্বেদ ৫. ৫৪. ১১) হাতের বা পায়ের খাড়ু বলিয়া মনে হয়। অথর্ববেদের (৮. ৬. ৭) 'তিরীটিনঃ' অর্থে সায়ণ মনে করেন অন্তর্ধাননিপুণ। কিন্তু অনেকের মতেই তিরীট একপ্রকার শিরোভূষণ। 'নিষ্ক' (ঋগ্বেদ ২. ৩৩. ১০; ৮. ৪৭. ১৫ ইত্যাদি) হইল গলার হার। নিষ্ক নামে একপ্রকার মুদ্রাও পরে দেখা যায়। হয়তো মোহরের মত বস্তুর মালা। 'স্তোচনী'

(ঋগ্বেদ ১০. ৮৫. ৬) অর্থ সায়ণ বলেন দাসী। সূর্যার বিবাহে ন্যোচনী দেওয়া হইয়াছিল। কেহ মনে করেন ভূষণবিশেষ। অথর্বে ব্রাত্যসূক্তে 'প্রবত' দেখা যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকার মতে ইহা কুণ্ডল বিশেষ। 'প্রাকাশ' (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১. ৮. ২. ৩) বোধ হয় দর্পণ। মৈত্রায়ণী-সংহিতায় 'প্রাবেপ'ও এই বস্তুই (৪. ৪. ৮)। ঋগ্বেদে (৮. ৭৮. ২) দেখা যায়, "সচা মনা হিরণ্যয়া"; সায়ণ অর্থ করেন, মননীয় হিরণ্ময় উপকরণ। 'রুক্ম' (ঋগ্বেদ ১. ১৬৬. ১০ ইত্যাদি) হইল বুকের অলংকার। ইহা প্রায়ই স্বর্ণময় হইত। খুব সম্ভব ইহা গোলাকার হইত। ইহা ঝুলাইবার যে হার তাহাকে বলিত 'রুক্মপাশ' (শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬. ৭. ১. ৭. ২৭)। রুক্মিণী ইহা হইতেই সম্পন্ন শব্দ। যড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৫. ৬) 'বি-মুক্তা'ও দেখা যায়। অথর্বে 'শঙ্খ' দেখা যায় (৪. ১০. ১); তাহার সম্বন্ধে সায়ণ বলেন, উপনয়নের পরে বালকের দেহ শঙ্খমণির দ্বারা ভূষিত করিবে, "শঙ্খমণিং বধ্নীয়াৎ"। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (২. ৩. ১০. ২) 'স্থাগর' নামক অলংকারের উল্লেখ আছে, কিন্তু জিনিসটা কি তাহা বুঝা গেল না। 'স্রজ্' মালা বা হারের নাম বহু স্থলেই উল্লিখিত (ঋগ্বেদ ৪. ৩৮. ৬ ইত্যাদি)। 'মণি' শব্দও বেদে বহুস্থানে পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ ১. ৩৩. ৮), হারে গাঁথিয়া গলায় মণি ঝুলানো হইত। যজুর্বেদ পুরুষমেধপ্রসঙ্গে মণিকারেরও উল্লেখ আছে।

নারীদের স্থান

ঋগ্বেদ প্রভৃতির সময়ে, অর্থাৎ প্রাচীনতর বৈদিকযুগে, আর্যদের মধ্যে নারীদের বেশ একটি গৌরব ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সামাজিক হিসাবে নারী স্বামীর দ্বারা চালিত হইলেও পরিবারের মধ্যে, যাগযজ্ঞে, উৎসবাদিতে নারীর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। গৃহে তিনি 'পত্নী' অর্থাৎ স্বামিনী। বিবাহকালে তিনি শ্বশুর দেবর প্রভৃতি পরিজনের কাছে 'সম্রাজ্ঞী' হউন ইহাই ছিল প্রার্থিত (ঋগ্বেদ ১০. ৮৫. ৪৬ ইত্যাদি)।

যখন ভারতে আর্যেরা আসেন তখন তাঁহাদের নারীর সংখ্যা কম ছিল। এ দেশে আসিয়া তাঁহারা আর্যেতর জাতির কন্যাদের বিবাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কন্যা সুলভ হইল। অনেক কন্যার, বিশেষ করিয়া কুরূপা ও ভ্রাতৃহীনা কন্যাদের, বিবাহ হওয়া কঠিন হইল। ক্রমেই নারীর মহত্ত্ব কমিতে লাগিল। আবার যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিপুলতার সঙ্গে ব্রাহ্মণের গৌরববৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেও নারীদের গৌরব কমিতে লাগিল। অনেক শূদ্র-কন্যা আর্যদের পত্নী হওয়ায় ক্রমে সব নারীদেরই শূদ্রার সমান ধরিয়া লওয়া হইল। অথচ পূর্বে বহু নারী বৈদিক মন্ত্রের রচনাও করিয়াছেন। কিন্তু পরে তাঁহারা বেদ উচ্চারণেরও অধিকারী হইলেন না। মৈত্রায়ণী-সংহিতা বলিলেন, নারীরা ঝুঠা, নারীরা দুর্ভাগ্য ; সুরা, জুয়াখেলার মত তাহারাও নেশামাত্র (১. ১০. ১১ ; ৩. ৬. ৩)।

তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৬. ৫. ৮. ২) বলিলেন, নারী যতই ভালো হউক না কেন তবু সে অধম পুরুষেরও নিকৃষ্ট। রাত্রিতে স্বামীকে ভুলাইয়া কাজ আদায় করাই নারীর সাধনা (কাঠক-সংহিতা ৩১. ১)। রাজনীতিতে নারীর স্থান নাই, যজ্ঞে ও বৈদিক স্তোত্ররচনাতে তাহার কাজ ক্রমেই কমিতে লাগিল। তখনও দুই একজন ব্রহ্মবাদিনী নারীর উল্লেখ পাই। তখন পর্যন্ত নারীদের পক্ষে ঐ রাস্তাটাই একমাত্র খোলা ছিল।[৩৫] অথচ পূর্বে বেদে বহু স্থানে নারীদের মহত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, এবং আদর্শের দিক দিয়া নারীদের

৩৫ Nanjundayya and Iyer, *Mysore Tribes and Castes*, Vol. II, pp. 401-402

সম্মানের কথা বারবার ঘোষিত হইয়াছে। নারী পতির অর্ধাঙ্গ (শতপথ-ব্রাহ্মণ ৫. ২. ১. ১০)। বৃহদারণ্যকে (১. ৪. ৩) আদি-পুরুষ যে আপনাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া পতি এবং পত্নী হইলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

নারীর নিন্দার কথা প্রাচীন বৈদিক যুগে যে নাই তাহাও নয় (ঋগ্বেদ ৮. ৩৩. ১৭)। তবে মোটের উপর বেদের আদিযুগে আর্য-নারীদের অবস্থা ভালোই ছিল। ক্রমে কিন্তু নারীদের স্থান একটু-একটু করিয়া নামিতে আরম্ভ হইল। এ দেশে আসিয়া সুলভ শূদ্রা-পত্নী গ্রহণই কি তাহার একমাত্র হেতু?

ব্রাহ্মণভাগে দেখি, নারীরা স্বামীর পরে খাইবেন (শতপথ ১. ৯. ২. ১২)। যে নারী মুখে মুখে কথার জবাব দেয় না সেই অপ্রবাদিনী নারীই ভালো (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৩. ২৪. ৭)। তবে সন্তানের জন্মদাত্রীরূপে নারীর একটা সম্মান চিরদিনই ছিল। আর্যেরা সংখ্যায় অল্প, কাজেই সন্তান ও বংশ-রক্ষা আর্যদের একটা বড় কাম্য বস্তু ছিল। এই কারণেই কন্যার জন্ম অপেক্ষা পুত্রের জন্ম লোকে বেশি চাহিত। পুত্র যে পরম ব্যোমে জ্যোতির মত এবং কন্যা যে দুঃখের হেতু, তাহাও দেখা যায়। তবু প্রাচীনতর কালে নারীদের সামাজিক যে সম্মান ও অধিকার ছিল পরবর্তীকালে তাহা ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হইয়াছে। হয়ত বা দ্রাবিড় জাতির মধ্যে কুমারীদের চরিত্রগত শৈথিল্য দেখিয়াও আর্যেরা কিছু সাবধান হইয়াছেন।[৩৬]

৩৬ *Mysore Tribes and Castes*, Vol II, p 35

স্বামীর মৃত্যুর পর অনুগমনের কথাও দেখা যায়: এই নারী পতিলোক-প্রার্থনায় পরলোকগত তোমার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত—

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা
নিপদ্যতে উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্। অথর্ব ১৮. ৩. ১

ঋগ্বেদে পতির অনুগমনের কথা দেখা যায় না। বরং মৃত পতির পাশে শয়ান পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—

নারি অভি জীবলোকম্ এহি। ঋগ্বেদ ১০. ১৮. ৮

হে নারি, জীবনলোকে ফিরিয়া আইস।[৩৭]

আশ্বলায়ন বলেন, নারীর দেবর এই কথা বলিয়া নারীকে মৃতপতির পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া আনিবেন—

তামুত্থাপয়েদ্ দেবরঃ। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র ৪. ২. ১৫-১৮

ইহাতে অনুমিত হয়, দেবরই বিধবাকে লইয়া ঘর করিত। 'দেবর' কথার মধ্যেও দ্বিতীয় বরত্ব সূচিত হয়। যাস্কই বলিয়াছেন—

দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বরঃ। নিরুক্ত ৩. ১৫

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের এই মন্ত্রটি দেখিলে এই কথাটা আরও স্পষ্ট বুঝা যায়। বিধবা যেমন করিয়া দেবরকে, নারী যেমন পুরুষকে শয়নের দিকে টানিয়া আনে, তেমন করিয়া কে তোমাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবে?

কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং
মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ। ঋগ্বেদ ১০. ৪০. ২

দেবরের সঙ্গে পুত্রার্থ বাগদত্তা বিধবার সমাগম মনুও (৯. ৬৯-৭০) ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে তাহা বিবাহ নহে; গুরুজনের বা তদভাবে রাজাজ্ঞায় দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তির বিধান নারদীয়-মনুসংহিতায় (১২. ৮০; ১২. ৮৭) আছে।

দেবর ছাড়াও অন্যলোকের সহিতও বিধবার বিবাহ দেওয়া হইত। তবে

৩৭ বরং ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে পতিহীনা হইলেও এইসব নারীরা অবিধবা হইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়া 'সুপত্নী' হইয়া গৃহধর্মচারিণী হউন (১০. ১৮. ৭)। পূর্বেও এই বিষয়ে কিছু বলা হইয়াছে।

দেবরের বেশি দাবি ছিল। তাহাতে সংসারটা বিচ্ছিন্ন হইতে পারিত না। রামায়ণে বালির পত্নী তারার এবং রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর দেবরের সঙ্গে বিবাহের কথা আমাদের দেশে লোকপ্রচলিত। বালি শাস্ত্রনিষ্ঠ ধার্মিক ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি-পুত্র রাবণও বেদযজ্ঞাদিপারগ ছিলেন। রাক্ষসীগর্ভোৎপন্ন হইলেও রাবণ কুম্ভকর্ণাদি ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া ব্রাহ্মণই ছিলেন, তাঁহাদের বধ করায় রামের ব্রহ্মহত্যা পাতক ঘটিয়াছিল। তবু বানর ও রাক্ষস নামে পরিচিত হওয়ায় তাঁহাদের নজির উল্লেখ করা হইল না।

মহাভারতে দেখা যায়, নাগরাজ হৃতপুত্র ঐরাবতের স্নুষাতে (পুত্রবধূতে) অর্জুনের এক পুত্র জন্মে। সেই মেয়েটির স্বামী সুপর্ণের দ্বারা হৃত হইলে সন্তানহীন ঐরাবত সেই দুখিনী স্নুষাকে অর্জুনের কাছে সম্প্রদান করেন। কামবশানুগ অর্জুন সেই ঐরাবত-স্নুষাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন। তাহাতেই বীর্যবান ইরাবানের জন্ম (মহাভারত ভীষ্ম ৯০. ৭-৯)। অর্জুন যখন ইন্দ্রলোকে যান তখন ইরাবান তাহা শুনিয়া অর্জুনের কাছে গিয়া বলেন, আমি ইরাবান্, তোমার পুত্র (ঐ ১২-১৩)। অর্জুন তখন গতবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেবলোকে পুত্রকে বলিলেন, যুদ্ধকালে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে। সেই সন্তানও গুণে অর্জুনবৎ ছিলেন। অর্জুন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীত হইলেন (ঐ ১৫-১৭)। পরে মহাভারত-যুদ্ধকালে ইরাবান পাণ্ডবদের সহায়তা করিয়াছিলেন (ঐ ১৭)।

ইহাতেই বুঝা যায়, কেহ কেহ স্বামীর অনুমৃতা হইলেও অনেকে অনুমৃতা হইতেন না। ইহাদের মধ্যে অনেকে পুনরায় বিবাহও করিতেন। কাজেই বসিষ্ঠাদি ধর্মসূত্রে তাহার ব্যবস্থা দেখা যায়। বোধায়ন ধর্মসূত্র বলেন, যে কন্যা উদকপূর্বপ্রদত্তা যাহার বিবাহ-হোমাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, এমন কন্যার স্বামী যদি মরিয়া যায় এবং যদি সে স্বামীর সঙ্গে ঘর না করিয়া থাকে তবে পৌনর্ভব-বিধিতে তাহার পুনরায় বিবাহ দিবে—

> নিসৃষ্টায়াং হুতে বাপি যস্তৈ ভর্তা ম্রিয়েত সঃ।
> সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্ গতপ্রত্যাগতা সতী॥
> পৌনর্ভবেন বিধিনা পুনঃ সংস্কারমর্হতি। বোধায়ন ধর্মসূত্র, ৪. ১. ১৮

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৩. ২. ৪. ৪) 'দৈধিষব্য' কথা আছে। এই বিষয়ে কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র (২. ১. ২২) এবং কৌশিক-সূত্রও (৩. ৫ ; ১৩৭. ৩৭)

১০. ২৬)। দময়ন্তীর এই দ্বিতীয় স্বয়ম্বর যে অদ্ভুত কিছু ছিল না তাহা বুঝি সেই সভায় রাজারা সবাই আসিলেন।

মনুর সময়ে নারীদের প্রাচীন অধিকার অনেকটা সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল। পূর্বে দোষ থাকিলে পতি পত্নীকে, এবং পত্নী পতিকে যে ত্যাগ করিতে পারিতেন তাহাতেও পতি হইতে পত্নীর অধিকার কম ছিল। মনুর সময়ে ততটুকু অধিকারও আর রহিল না। নিয়ম ছিল, পতি বিদেশে যাইবার সময় স্ত্রীর বৃত্তিব্যবস্থা করিয়া যাইবেন (মনু ৯. ৭৪)। যদি বৃত্তি না থাকে তবে সুতা কাটিয়া বা অনিন্দিত শিল্পের দ্বারা স্ত্রী জীবিকা সংগ্রহ করিবেন (ঐ ৯. ৭৫)। ধর্মার্থ বিদেশগত পতির জন্য স্ত্রী আট বৎসর, বিদ্যা বা যশোলাভার্থ-গত পতির জন্য ছয় বৎসর, কামার্থগত পতির জন্য তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবেন (ঐ ৭. ৯. ৭৬)। তার পর স্ত্রী যে কি করিবেন তাহা মনু লেখেন নাই। তাহার পর স্ত্রীর কর্তব্য কি তৎসম্বন্ধে মনুর টীকাকারদের মধ্যে সর্বজ্ঞ নারায়ণ, কুল্লূক ও রাঘবানন্দ, বসিষ্ঠ-স্মৃতির অনুসারে স্বামীর কাছে স্ত্রী যাইবেন এইরূপ বলিয়াছেন। শুধু নন্দন ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ঊর্ধ্বং ভর্ত্রন্তরপরিগ্রহে ন দোষোঽস্তি ইতি অভিপ্রায়ঃ।

অর্থাৎ ইহার পর স্ত্রীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ ছাড়া আর কি উপায় আছে? কিন্তু মেধাতিথি তাহাও সমর্থন করেন নাই।

দ্বেষ-পরায়ণা স্ত্রীকে মনু (৯. ৭৭) এক বৎসরের পরই পরিত্যাগ করিবার বিধান দেন। মদ্যরতা, দুশ্চরিত্রা, ব্যাধিতা, পতিবিদ্বেষিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া পতি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিবেন (৯. ৮০)। বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, অপ্রিয়ভাষিণী হইলেও মনুর মতে (৯. ৮১) স্ত্রী ত্যাজ্যা। তবে পীড়িতা সুশীলা স্ত্রীর কাছে অনুমতি লইয়া স্বামী বিবাহ করিবে (৯. ৮২)। স্ত্রী যদি রোষবশতঃ চলিয়া যাইতে চাহে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বর্জন করিবে (৯. ৮৩)। ব্যাধিতা, বিগর্হিতা, বিপ্রদুষ্টা এবং প্রতারণা পূর্বক গছাইয়া দেওয়া কন্যাও বর্জন করিবে (৯. ৭২)। কাজেই পতির পক্ষে স্ত্রীত্যাগ মনুর হিসাবে খুবই সহজ। পত্নীদের পক্ষে পতিত্যাগ প্রায় অসাধ্য। পুরাতন যেসব অধিকার নারীদের ছিল, মনুর সময়ে তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য (১. ৭২) বিধান করেন, ব্যভিচারে গর্ভ হইলে এবং ভর্তৃবধ-প্রবৃত্তি থাকিলে স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে। নারদও তাহাই বলেন (নারদীয়-মনু ১২. ৯৪)।

কিন্তু একসময়ে বিবাহবন্ধন পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই রীতিমত বন্ধন ছিল। অতিপ্রাচীন আইনগ্রন্থ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (৩. ৩. ২২) বলেন, অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারিপ্রকার বিবাহবন্ধন ইচ্ছা করিলেই ছিন্ন করা যায় না—

অমোক্ষো ধর্মবিবাহানাম্ ইতি।

—কাহারও পক্ষে তাহা সহজে ছিন্ন করার উপায় ছিল না। কিন্তু স্ত্রী যদি সাধ্বী না হয় তবে বর্ণান্তরের সংস্পর্শ হইতে পারে, এই মনে করিয়া জাতিভেদ যখন প্রবল হইল তখন এই বিষয়ে আইন একটু কড়া হইল, অর্থাৎ স্ত্রীর চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে ত্যাগ করা চলিবে এইরূপ বিধান সহজতর হইল। ব্যভিচারেও সবর্ণার সঙ্গে কিংবা নিম্নতরবর্ণার সঙ্গে ব্যভিচার ঘটিলে দোষ কম হইত।[৩৮]

আসলে পতিপত্নীসম্বন্ধ সহজে ছেদ্য নয় (নারদ ১২. ৯২)। এক সময়ে নারীদের নৈতিক বিষয়ে সামাজিক কড়াকড়ি কম ছিল। বসিষ্ঠ-স্মৃতি তো স্পষ্টই বলেন, ব্যভিচারে নারী দূষিত হয় না (২৮. ১)।

এই কথায় চমকাইলে চলিবে না। এমন সময়ও ছিল যখন বিবাহপ্রথাই প্রবর্তিত হয় নাই। তখন নরনারী যথেচ্ছ বিহারের দ্বারা সন্তানলাভ করিত—

অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি। মহাভারত, আদি, ১২২. ৪

তাহাদের এই ব্যভিচারে তখন অধর্ম হইত না, ইহাই পূর্বে ধর্ম ছিল—

নাধর্মোঽভূদ্ বরারোহে স হি ধর্মঃ পুরাভবৎ। ঐ ১২২. ৫

রাজা পাণ্ডুর সময়েও এই ধর্ম উত্তরকুরুতে চলিত ছিল (ঐ ১২২. ৭)। এই সনাতনধর্ম ই স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহকর—

স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ। ঐ ১২২. ৮

এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ (ঐ টীকা) বলেন, বেদমতে বামদেব্যব্রতচারিণী নারী সঙ্গম প্রার্থনা করিলে তাহা পূরণ করাই ধর্ম।

উদ্দালক-পত্নীকে এক ব্রাহ্মণ সঙ্গমার্থ হঠাৎ 'চল যাই' বলিয়া লইয়া গেলে পুত্র শ্বেতকেতু ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইলেন (ঐ ১২২. ১০-১২)। উদ্দালক বলিলেন, বাছা, রাগ করিও না, ইহাই সনাতন ধর্ম। সর্ব বর্ণের নারীরাই অনাবৃতা—

৩৮ বৃহদ্-যম, ৪.৪৬-৪৮ ; বসিষ্ঠ-স্মৃতি ২১ অধ্যায় ; বৃদ্ধহারীত ৯. ৩১৬

মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অনাবৃতা হি সর্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি। ঐ ১২২. ১৪

তখন শ্বেতকেতু বলিলেন, এই ধর্ম সনাতন হইলেও ভালো ধর্ম নহে; আজ হইতে ইহা চলিবে না; লোকে আপন আপন পত্নী ছাড়া অন্যত্র গমন করা অধর্ম হইবে (ঐ ১২২. ১৭-২০)।

এই ভাবে শ্বেতকেতু সনাতনধর্ম নিষেধ করিয়া বলপূর্বক এই মর্যাদা স্থাপন করিলেন—

মর্যাদা স্থাপিতা বলাৎ। ঐ ২০

শ্বেতকেতুর কথা পূর্বেও একটু বলা হইয়াছে।

বনপর্বেও দেখা যায়, নরনারী সকলেই অনাবৃত; ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম; বিবাহাদি বিধি হইল এই স্বাভাবিক নিয়মের বিকারমাত্র—

অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা নরাশ্চ বরবর্ণিনি।
স্বভাব এষ লোকানাং বিকারোঽন্য ইতি স্মৃতঃ॥ বন ৩০৬. ১৫

হয়ত এই কথাতে এখনকার দিনের যৌনবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ খুব খুশি হইবেন।

দীর্ঘতমা ঋষি ছিলেন বৃহস্পতির পুত্র। তিনি গোরুর মত নারীদের সঙ্গে যথেচ্ছ বিহার করায় তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হন। দীর্ঘতমা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন। ঋষিপত্নী বলিলেন, তোমার সেবা না করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিব (আদি ১০৪. ২২-৩৪)। দীর্ঘতমাও ক্রোধ করিয়া বলিলেন, আজ হইতে আমিও নিয়ম করিলাম যে নারী যাবজ্জীবন এক পতি লইয়াই থাকিবে—

অদ্য প্রভৃতি মর্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্।
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্ নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্। আদি ১০৪. ৩৪-৩৫

শ্বেতকেতুর দ্বারা মর্যাদা স্থাপিত হইল বটে কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমাজে তাহা স্বীকৃত বা পালিত হয় নাই। নারীরা ঋতুস্নাতা হইয়া স্বামীর সহিত সঙ্গতা হইলেও অন্য সময়ে যে-কোনো পুরুষের সঙ্গে বিহার করিতে পারিতেন। ধর্মবিদেরাও এই কথাই বলিতেন—

ঋতাবৃতৌ রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্তা পতিব্রতে॥
নাতিবর্তব্য ইত্যেবং ধর্মং ধর্মবিদো বিদুঃ।
শেষেষন্যেষু কালেষু স্বাতন্ত্র্যং স্ত্রী কিলার্হতি। আদি ১২২. ২৫-২৬

মহাভারতে শান্তিপর্বে তাই দেখা যায়, বাস্তবিক কে কাহার ঔরসে জন্ম লইয়াছে সেই তথ্য মাতা ছাড়া আর কেহই জানে না (শান্তি ২৬৫. ৩৫)।

এইজন্যই মনু (৯. ২০) পুরাতন শ্রুতির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

যন্মে মাতা প্রলুলুভে। ইত্যাদি

অন্যত্র এই মন্ত্রের আলোচনা করা গিয়াছে।

বসিষ্ঠ-স্মৃতিতেও দেখা যায়—

ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ। স্মৃতি-সমুচ্চয়, ২৮. ১

তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। অত্রি-সংহিতায়ও (১৯৩, স্মৃতি-সমুচ্চয়) এই বচনটি দেখা যায়। অত্রি আরও বলেন, যদি অসবর্ণ পুরুষের দ্বারা নারীতে গর্ভনিষিক্ত হইয়া থাকে তবে গর্ভমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নারী অশুদ্ধ। তাহার পরই তাহার শুদ্ধি ঘটে। যখন পুনরায় রজোদর্শন হয় তখন সেই নারী বিমল কাঞ্চনের মত বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়—

অসবর্ণৈস্তু যো গর্ভঃ স্ত্রীণাং যোনৌ নিষিচ্যতে।
অশুদ্ধা সা ভবেন্নারী যাবদ্ গর্ভং ন মুঞ্চতি॥
বিমুক্তে তু ততঃ শল্যে রজশ্চাপি প্রদৃশ্যতে।
তদা সা শুধ্যতে নারী বিমলং কাঞ্চনং যথা॥ অত্রি, ১৯৫-১৯৬

দেবল-স্মৃতিতেও (৫০. ৫১) ঠিক এই দুইটি শ্লোক দেখা যায়। জাতিভেদের কড়াকড়ি যতই বাড়িতে লাগিল ততই পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীত্যাগ সহজ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার পূর্বে নারীদের প্রতিও সামাজিক বিধি রীতিমত উদার ও বন্ধনমুক্ত ছিল।

নারীদের এই স্বাধীনতা ক্রমে যে সংযত হইয়া আসিল এবং সমাজব্যবস্থার অধীন হইল, ইহাতে নারীদেরও সম্মতি ছিল বলিয়াই মনে হয়। কামনার বেগ যতই দুর্বার হউক নারীদের মধ্যে যে মাতৃত্বের একটি দায় আছে এবং অন্তর্নিহিত কল্যাণের একটি আদর্শ আছে, তাহাতে মনে হয় ক্রমে নারীরাই আপনাদের এই উদ্দাম স্বাধীনতাকে সংযত করিয়া আনিলেন। নহিলে শুধু বাহির হইতে সামাজিক অনুশাসনে এইরূপ হওয়া সহজ হইত না। পৃথিবীর আদিযুগে ক্রমাগত ভূগর্ভস্থ অগ্নির তাণ্ডবলীলা ভূমিকম্প প্রভৃতিরই যুগ ছিল। ক্রমে তাহা সংযত হইয়া এই পৃথিবী ধীরে ধীরে জীবধাত্রী হইয়া উঠিল। নারীদেরও ইতিহাস মনে হয় অনেকটা এইরূপ। আপন মাতৃত্বের খাতিরে

এবং অন্তরস্থিত কল্যাণ-আদর্শের তাগিদে ক্রমে ক্রমে আপনা হইতেই তাঁহারা নিজেদের স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিলেন।

এখনও নারীদের মধ্যে দুইটি ধারা দেখা যায়। একটি ধারা ভোগসুখময়ী উর্বশীর সহিত আর-একটি ধারা স্নেহসেবাময়ী লক্ষ্মীর সহিত তুলনীয়। ধীরে ধীরে নারীরা আপনা হইতেই আপন মাতৃত্বসুলভ মাহাত্ম্যে সেই লক্ষ্মী-স্বরূপের দ্বারা উর্বশী-স্বরূপকে ক্রমে ক্রমে এত কাল জয় করিয়া আসিতেছেন। ইহাই সর্বদেশে নারীদের ইতিহাস, সকল কালেরও ইহাই মহাসত্য। তাই যোগতত্ত্ব উপনিষদে (৪) আছে। এই নারীই এক দিকে প্রেয়সী ভার্যা, অন্য দিকে তিনিই কল্যাণময়ী মাতৃস্বরূপা—

যা মাতা সা পুনর্ভার্যা যা ভার্যা জননী হি সা।

নারীর বিশুদ্ধি

স্বেচ্ছায়-ব্যভিচারের কথার সঙ্গে-সঙ্গে অনিচ্ছায় দূষিত নারীদের শুদ্ধির ব্যবস্থার বিষয়ও বলা প্রয়োজন। যদি স্বয়ং বিপ্রতিপন্না নারী বলপূর্বক প্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা হয় তবে সেই দূষিতা নারীকে ত্যাগ করিবে না—

ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী।

শুধু ঋতুকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে, তাহাতেই সে শুদ্ধ হইবে (অত্রিসংহিতা, ১৯৭-১৯৮)। রজক, চামার, নট, বুরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্ত অন্ত্যজ। যদি ইহাদের সঙ্গে মোহবশতঃ নারীর ব্যভিচার ঘটে তবে জ্ঞানকৃত হইলে এক বৎসর, অজ্ঞানকৃত হইলে বর্ষদ্বয় চান্দ্রায়ণ-ব্রত আচরণ করিবে (ঐ ১৯৯-২০০)। ম্লেচ্ছদের দ্বারা সকৃদ্‌ভুক্তা নারী প্রাজাপত্যব্রত এবং ঋতুস্রাবের দ্বারা শুদ্ধ হয় (ঐ ২০১)। বলাৎ হৃতা নারী সকৃদ্-ভুক্তা হইলে প্রাজাপত্যের দ্বারা শুদ্ধি হয় (ঐ ২০২)।

এইসব বিষয়ে দেবলের স্মৃতি আরও সহজ ব্যবস্থা দিয়াছেন। দেবল বোধ হয় সিন্ধুদেশের স্মৃতিকার। তখন পশ্চিম হইতে সিন্ধুদেশে যেসব বৈদেশিক আক্রমণ আসিত তাহাতে বহু নারী দূষিত হইত। তাহাদের সম্বন্ধে সামাজিকভাবে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহাই দেবলস্মৃতিতে দেখা যায়। আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত স্মৃতিসমুচ্চয় গ্রন্থে দেবলস্মৃতিও দেওয়া আছে। তাহা হইতেই আলোচনা করা যাউক। দেবল বলেন, ম্লেচ্ছের দ্বারা বলপূর্বক নারী হৃতা হইলে, ব্রাহ্মণী-ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যা ও শূদ্রা নারী অন্ত্যজদের দ্বারা হৃতা হইলে, ম্লেচ্ছান্ন খাইয়া থাকিলে, দ্বাদশদিনব্যাপী পরাক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ব্রাহ্মণী শুদ্ধা হয়, অন্যেরা আরও অল্পে শুদ্ধা হয়। অভক্ষ্য না খাইলে এবং মৈথুন না হইয়া থাকিলে তিন রাত্রিতে নারীর শুদ্ধি হয় (দেবলস্মৃতি ৩৬-৩৯)। ম্লেচ্ছান্ন, ম্লেচ্ছসংস্পর্শ ও এক বৎসর বা বৎসরের বেশি তাহাদের সহ সংস্থিতিতে তিন রাত্রিতে শুদ্ধি হয় (ঐ ৪৪)। পুরুষও কেহ যদি ম্লেচ্ছহৃত বা চৌরহৃত হইয়া ভয়ে বা ক্ষুধায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য খাইয়া দেশে ফিরে, তবে ব্রাহ্মণ হইলে একটি কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবেন, ক্ষত্রিয় তাহার অর্ধ, বৈশ্য তাহার পাদোন এবং শূদ্র তাহার পাদমাত্র আচরণ করিলে শুদ্ধ হন (ঐ ৪৪-৪৬)। ম্লেচ্ছের

দ্বারা বলপূর্বক গৃহীতা নারী গর্ভবতী না হইলে তিন রাত্রিতে শুদ্ধি; যদি গর্ভ হয়, তবে শুদ্ধি হইবে কৃচ্ছ্র সাংতপন এবং ঘৃতলেপের দ্বারা (ঐ, ৪৭-৪৯)। অসবর্ণ পুরুষের দ্বারা গর্ভ হইলে গর্ভমুক্তির পর রজোদর্শন হইলেই তপ্তকাঞ্চনের মত নারীর শুদ্ধি হয় (ঐ ৫০-৫১)। সেই সময়ে ম্লেচ্ছদের দ্বারা হৃতা হইয়া দীর্ঘকাল যেসব নারীর ম্লেচ্ছদের সঙ্গে থাকিতে হইত তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্তের কথাও দেবল ইহার পর বিচার করিয়াছেন। এই বিষয়ে যাঁহার জানিবার ইচ্ছা তিনি মূলগ্রন্থে তাহা দেখিতে পারেন।

এই স্মৃতিসমুচ্চয়ে বৃহদ্-যমসংহিতায় দেখা যায়, নারীদের ব্যভিচার হইলে ঋতুস্রাব হইলেই শুদ্ধি হয়। তবে গর্ভ হইলে স্ত্রীত্যাগ করা যায়, অন্যথা স্ত্রীত্যাগ যুক্ত নহে—

ব্যভিচারাদ্ ঋতৌ শুদ্ধিঃ স্ত্রীণাং চৈব ন সংশয়ঃ।
গর্ভে জাতে পরিত্যাগো নান্যথা মম ভাষিতম্। বৃহদ্-যম ৪. ৩৬

জার-দোষে নারীরা দূষিত হয় না, এই কথা বসিষ্ঠ যে বলিয়াছেন তাহা আগেই দেখানো হইয়াছে (বসিষ্ঠ, ২৮. ১)। নারীরা দেবতার প্রসাদে সর্বকল্মষের অতীত (বসিষ্ঠ, ২৮. ৬)। তবে এই তিনটি পাপ হইলে নারী পতিত হয়— পতিবধ, ভ্রূণহত্যা ও নিজের গর্ভপাত (বসিষ্ঠ, ২৮. ৭)। নারদীয় মনুতে (১২. ৯৪-৯৬) অনুরূপ কয়েক স্থলে স্ত্রীকে নির্বাসন দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে।

নারদীয় মনু অতি প্রাচীন শাস্ত্র। ইহাতে পাণিগ্রহণ সংস্কারের ফল সারাজীবন থাকে (১২. ৩)। পতিপত্নীর বিবাহবিচ্ছেদ বিহিত হয় না। তবে ব্যভিচার-দোষে বন্ধনচ্ছেদন হইতে পারে (১২. ৯২)। বিনাদোষে স্ত্রী-ত্যাগে পতি দণ্ডার্হ (ঐ ১২. ৯৭)। কাজেই দেখা যায়, সহজে স্ত্রীত্যাগের উপদেশ সকলে দেন নাই। বৌধায়ন-স্মৃতি (২. ২. ৬৫) দেবতার প্রসাদে নারীকে নিষ্কলঙ্কা বলিয়াছেন, কিন্তু বন্ধ্যা স্ত্রীকে দশম বৎসরে, কন্যামাত্রপ্রসবিনীকে দ্বাদশে, মৃতপ্রজাকে পঞ্চদশে এবং অপ্রিয়বাদিনীকে সদ্য ত্যাগ করিতে বিধান দিয়াছেন।

প্রাচীন ঋষিদের মতে বিবাহ পতিপত্নীর একটা সম্বন্ধ যাহা পবিত্র। তাহা সহজে ছেদ্য নয়। তবে কারণ-বিশেষে ছেদন করিবার ব্যবস্থা পুরুষকে কেহ কেহ দিয়া থাকেন, অথচ অনেক সময় অনেকেই সেই অধিকার নারীকে দেন নাই।

দ্রাবিড়-সমাজের মত আর্যদের সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থা মাতৃতন্ত্র না হইলেও আর্যদের মধ্যে বৈদিকযুগে নারীদের বেশ প্রতিষ্ঠা ও সম্মান ছিল, কাজেই তাঁহাদের অধিকারও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। আদর্শ হিসাবেও তাঁহাদের স্থান বেশ উচ্চ ছিল। তাই নারীদিগকে 'নিষ্কল্মষা' 'মেধ্যা' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। এবং সহজে কোনো দোষে তাঁহাদের পরিত্যাগ করা অনেকেই পছন্দ করেন নাই, তাহা এইমাত্র দেখানো হইল। নারী হইলেন পত্নী, পতিকুলে তিনি সম্রাজ্ঞী, পত্নী-বিনা যজ্ঞ অসাধ্য— এই সবই জানা কথা। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিলেও স্বর্ণসীতাকে পাশে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ক্রমে এমন একটা যুগ আসিল যখন আসল নারীকে নির্বাসন দিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বড় বড় কথা স্বর্ণসীতার মত বামে রাখিয়া সমাজ চলিতে লাগিল।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

কুসুমধর্মাণো হি যোষিতঃ সুকুমারোপক্রমাঃ। কামসূত্র, ১৭ অধ্যায়, পৃ ১৯৯

অর্থাৎ নারীরা কুসুমবৎ সুকুমার, কাজেই তাহাদের প্রতি ব্যবহারও সুকুমার হওয়া চাই। সহৃদয়তার সহিত নারীদের সহিত ব্যবহার করা চাই। বাৎস্যায়ন লিখিতেছেন কামশাস্ত্র। কাজেই এখানে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লাভ নাই। তবে এই বিষয়ে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ধর্মশাস্ত্র-ব্যবস্থাপকেরাও একমত। যেসব কর্কশ ও পরুষ দণ্ড পুরুষের প্রতি তাঁহারা বিধান করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অনেকেই নারীদের প্রতি ব্যবহার করিতে দেন নাই। ঐ বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সকলেই নারীদের প্রতি সহৃদয়তার কথা বলিলেও দায় ও সামাজিক ব্যবহারপ্রকরণে সকলে সমান উদার মত দেখাইতে পারেন নাই। স্মৃতিকারেরা নারীদের স্থানবিশেষে নিন্দা করিলেও নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন যে কর্তব্য সে কথা প্রায় সকলেই বলিয়াছেন। মনু (২. ১২৩) প্রভৃতি সমাজপতিরা নারীদের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এখানে মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্টও সমর্থন করিয়াছেন। মনু (২. ১৩১-১৩৩) নারীদের প্রতি সম্পর্ক ও বয়সের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং উচ্চজাতীয়াদের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত, যেন সেই ভাবেই বেশি বলিয়াছেন। নিঃসম্পর্ক নারীকে ভগিনী বা সুভগা বলিয়া সম্বোধন করিবে

(২. ১২৯)। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র (১. ৪. ১৪. ১৮) বলেন, পতির বয়স অনুসারেই নারীদের সম্মান দেখানো উচিত—

পতিবয়সঃ স্ত্রিয়ঃ।

গুরুপত্নীকে ও গুরুর পুত্রবধূদের প্রতিও সম্মান দেখানো বিহিত ছিল।[৩৯] সম্পর্কের কথা ছাড়িয়াও নারীকে সম্মান করা উচিত। তাই মনু (৩. ৫৫) বলেন, পিতা পতি দেবর ভ্রাতা সকলেই নারীকে সম্মান দেখাইবেন। মনু নারীকে সম্মান দিতে বলিলেও স্বাধীনতা দিতে বলিতে পারেন নাই। বাল্যকালে নারী পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন। স্বাধীন সে কখনই নয় (মনু ৯. ৩)। কারণ নারীরা সহজেই নষ্ট হয় (ঐ ৯, ৫-২০)। দক্ষস্মৃতির (৪. ৮-৯) কথা আরও সাঙ্ঘাতিক।

বৈদিক যুগে কিন্তু নারীরা সকলের সঙ্গে সভা প্রভৃতিতে যোগদান করিতে পারিতেন। ঋগ্বেদে (১.১৬৭.৩) দেখি—

যোষা সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্।

সেই বাণী সভা ও বিদ্বজ্জনের উপযুক্তা নারীর মত।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৮৫. ২৬-২৭) নববধূকে 'বিদথম্ আ বদাসি' এবং 'বিদথম্ আ বদাথঃ' বলায় বুঝা যায়, যজ্ঞের ও উচ্চ জ্ঞানের উপযুক্ত ভাষা নারীদের ছিল। বিবাহকালে নিকটে আসিয়া সুমঙ্গলী বধূকে দেখিয়া আশীর্বাদ দিবার প্রার্থনা দেখিতে পাই (ঐ ৮৫. ৩৩)। পরবর্তীযুগে রাজবধূরা হয়ত ক্রমে সভা হইতে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন, তাহা বুঝা যায় পাণিনির গ্রন্থে (৩.২.৩৬)। এইখানে মহাভাষ্যও দেখা যাইতে পারে।[৪০] কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৩.৭.১১) ও শতপথ-ব্রাহ্মণে (১.৭.৩.১২) যে 'অন্তর্ধান' আছে, তাহা পত্নী সংযাজ যাগের একটি আচার বিশেষ।

বৌদ্ধদের গ্রন্থেও নারীদের অবরোধের কথা মাঝে মাঝে সূচিত হয় (ধম্মপদত্থ কথা), কিন্তু তাহা রাজরাজড়াদের ঘরের নারীদের বিষয়ে। রাজপথ দিয়া খোলা রথে বিশাখা পতিগৃহে যান।

রামায়ণেও আছে, যজ্ঞে বিবাহে স্বয়ংবরে যুদ্ধে ও ব্যসনে নারীদের

৩৯ গৌতম ও হরদত্ত, আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র ১.৪.১৪. ২০-২২

৪০ ১.১.৪৩.১০১ ; ২.১.১.৩৬১ ; ৩.২.৮০.১০৯

দর্শন দুষ্য নহে। মহাভারতে নারীদের সভা প্রভৃতিতে যোগদানের কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

মনুর সময়ে যথার্থ জীবনের ক্ষেত্রে নারীর সামাজিক অধিকার যতই সংকুচিত হউক না কেন, তবু বার বার আদর্শ হিসাবে নারীদের সম্মানের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। এ যেন সেই জীবন্ত সীতাকে সংসার হইতে বনবাস দিয়া মহাসভায় সর্বজনসমক্ষে স্বর্ণসীতার পূজা করা। এখনও যে দেখা যায় যে যাঁহারা আসলে সকলের স্বাধীনতা হরণে তৎপর তাঁহারাই জগৎসমক্ষে ঘন ঘন গণস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করেন। মনুতেও দেখি—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩.৫৬

যেখানে নারীরা পূজিত সেখানে দেবতারা প্রসন্ন, যেখানে নারীরা অপূজিত সেখানে সব ক্রিয়াই অফলা। মহাভারতেও এই কথা আছে (অনুশাসন, ৪৬. ৫-৬)। স্ত্রীলোকের মুখ সদাই শুচি—

নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাম্। মনু ৫.১৩০
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন, এই বাক্যও মনুরই (৯.২৬)।[৪১]

নারী প্রসন্ন না থাকিলে কুল রক্ষা হয় না (ঐ ৩. ৬১ ; ৯. ৮)। গৃহের ও পরিবারের শোভা এবং কল্যাণও হয় না (৩. ৬০—৬২)। কোথাও কোথাও কুলরক্ষার্থ নারীর আদর দেখা যায়। যেমন চলিত কথাতেও দেখা যায়— ‘ফলের লোভে গাছকে সেবা’।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সোম দেবতা নারীকে দিলেন শুচিতা, গন্ধর্ব দিলেন মধুর বাণী, অগ্নি দিলেন সর্বমেধ্যত্ব ,তাই নারীরা সদাই মেধ্যা—

মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ। ১.৭১

অত্রি সংহিতাও (১৪১) এই কথাই বলেন, এবং পরেও (১৯৪) এই কথার তিনি আবার সমর্থন করেন। বৌধায়ন-স্মৃতিতেও এই কথাই দেখি,

---

৪১ তুলনীয় : মহাভারত উদ্যোগ, ৩৮.১৯। দুষ্কুলাগত হইলেও স্ত্রী হইলেন অমূল্য রত্ন, মনু। (২.২৩৮)

তবে তিনি 'মেধ্যা' না বলিয়া স্ত্রীদিগকে 'নিষ্কল্মষা' অর্থাৎ নিষ্পাপা বলিয়াছেন।[৪২]

মহাভারতে বিবাহ (৪৪ অধ্যায়), স্ত্রীধন, যৌতক (৪৫ অধ্যায়), স্ত্রীপ্রশংসা (৪৬ অধ্যায়), রিকৃথ-ভাগ (৪৭ অধ্যায়), বর্ণসংকর কথন (৪৮ অধ্যায়), দানধর্ম (৪৯ অধ্যায়) প্রভৃতির আলোচনা অনুশাসন পর্বে আছে (৪৪-৪৯ অধ্যায়)। তবে তাহা প্রায় মনুর মতেরই সঙ্গে মিলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন কালে নারী আপন পতি আপনিই বরণ করিতেন। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে এবং তখনকার বিবাহ-অনুষ্ঠানগুলির রীতিনীতি দেখিলে তাহাই বুঝা যায়। ক্রমে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন ছেলেমেয়েদের স্বাধীন মতামত দেওয়া আর চলিল না। কারণ বিবাহের দুইটি দেবতা। প্রাচীন দেবতা হইলেন প্রজাপতি; তিনি দেখিয়া শুনিয়া ধীরে সুস্থে শাস্ত্রবিধি সমাজবিধি সব বাঁচাইয়া অগ্রসর হন। আর বিবাহের নবীন দেবতা হইলেন, 'মন্মথো দুর্নিবারঃ'। তিনি সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া অগ্রসর হন। কালিদাস-কৃত শকুন্তলার চরিতেও এই নবীন দেবতার কিছু প্রভাব দেখা যায়। তাই যখন দেখা গেল 'ধূমাকুলিতদৃষ্টি হইলেও যজমানের আহুতি অগ্নিতেই পড়িয়াছে', অর্থাৎ দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম জাতিপংক্তিবিরোধী হয় নাই, তখন গুরুজনেরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

পরবর্তী যুগে কন্যাদের স্বামী-নির্বাচনের অধিকার গুরুজনের হাতেই গিয়া পড়িল। কিন্তু গুরুরা যদি কেহ সময়মত কন্যাদের বিবাহে উদ্যোগ না করেন, তবে সেই স্থলে কন্যা নিজেই পতি সংগ্রহ করিতে পারে। বৌধায়ন-স্মৃতি (৪. ১. ১৫) বলেন, ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর কন্যা পিতৃশাসনের প্রতীক্ষা করিবে; তারপর চতুর্থ বর্ষে নিজেই উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে—

ত্রীণি বর্ষাণ্যৃতুমতী কাংক্ষেত পিতৃশাসনম্।
ততশ্চতুর্থে বর্ষে তু বিন্দেত সদৃশং পতিম্।

বোধায়ন-ধর্মসূত্র-বিবরণকার গোবিন্দ স্বামী ইহাকে স্বয়ম্বর-অধিকার বলিতেও সংকুচিত হন নাই—

এবং স্বয়ম্বরং পরিসমাপ্য ইত্যাদি। ৪. ১. ১৭ বিবরণ

৪২ আনন্দাশ্রম সংস্করণ ২.২.৬৪

মনুও (৯. ৯০) এই নীতি সমর্থন করিয়া সেই স্থলে কন্যাকে পতি-সংগ্রহের অধিকার দিয়াছেন। সর্বস্মৃতিই এইরূপ স্থলে কন্যার অধিকারকে স্বীকার করিয়াছেন। এমন স্থলে যদি অসবর্ণ বিবাহ হয় তাহা হইলেও অনুলোমক্রমে হইলে সন্তান পিতার সবর্ণ হইবে, এই পুরাতন বিধিও তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাই ব্যাস-স্মৃতি (২. ১০) বলিলেন, সবর্ণা বা কামতঃ অন্যজাতীয়া বিবাহিত পত্নীতে সন্তান সবর্ণা-জাত স্ববর্ণ সন্তানেরই সমান হইবে, তাহা হইতে হীন হইবে না।

যেখানে গুরুজন কন্যাকে বিবাহ দিতে যত্নশীল নহেন সেখানে বোধায়ন ধর্মসূত্র কন্যাকে শুধু পতি-বরণ করিবার অধিকারই দেন নাই, ভালো সদৃশ বর পাওয়া না গেলে অপেক্ষাকৃত অল্পগুণ বা গুণহীন বরকেও বরণ করিবার অধিকার দিয়াছেন (৪. ১. ১৫-১৬)। অথচ এই বোধায়ন ধর্মসূত্রই (২. ২. ৪৬) কৌমারে পিতাকে, যৌবনে স্বামীকে, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রকে নারীর অভিভাবকত্ব দিয়াছেন, তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া যে যায় না এই বিষয়ে মনুর সঙ্গে তিনিও সহমত।

এই বোধায়ন ধর্মসূত্রই পতি ক্লীব ও পতিত হইলে নারী যে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে, সেই কথা বলিয়াছেন। এই পুনর্ভূর গর্ভজাত সন্তানই পৌনর্ভব (২. ২. ২৭)। এইখানে বিবরণকার গোবিন্দ স্বামী বসিষ্ঠের সম্মতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিবাহিতা কন্যাও আবার বিবাহ করিতে অধিকারিণী তাহা বোধায়ন ধর্মসূত্র ধরিয়াছেন। বলপূর্বক অপহৃতা কন্যা যদি মন্ত্রসংস্কৃতা না হইয়া থাকে তবে সে অবিবাহিতা কন্যারই মত, তাহার বিবাহ হওয়া উচিত (৪. ১. ১৭)। কন্যাদান এবং বিবাহ-হোমের পর স্বামী মরিলেও সে কন্যা যদি অক্ষতযোনি হয়, তবে সে গতপ্রত্যাগতা; তাহাকে পৌনর্ভব বিধিতে পুনরায় বিবাহ দেওয়া উচিত (৪. ১. ১৮)। এখানে বুঝা যায় পৌনর্ভব বিবাহবিধি তখনও ছিল। এই বিষয়ে ধর্মসূত্রকার বোধায়নের বচন পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই পুনর্ভূসংস্কার অক্ষত বা ক্ষতযোনি উভয়বিধ কন্যারই হইতে পারে (যাজ্ঞবল্ক্য ১. ৬৭)।

পরাশরের পত্যন্তরগ্রহণব্যবস্থা সকলেই শুনিয়াছেন। পতি যদি নষ্ট মৃত প্রব্রজিত ক্লীব বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চবিধ আপদে পত্যন্তর বিধান করা যায়—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে। ৪. ২৮

এই পঞ্চস্থলে নারদীয় মনুতেও (১২. ৯৯) পত্যন্তরগ্রহণব্যবস্থা আছে। বসিষ্ঠও বলেন, উদকপূর্বদত্তা বা বাগ্দত্তা কন্যা যদি মন্ত্রোপনীতা না হইয়া থাকে তবে সে কুমারীই বলিতে হইবে এবং সে পিতারই অধিকারস্থা (বসিষ্ঠ, ১৭. ৬৪)। বলাপ্রহৃতা কন্যা যদি মন্ত্রসংস্কৃতা না হয় তবে সে অবিবাহিতা। কন্যারই মত তাহাকে অন্য পতির কাছে দান করিতে হইবে (ঐ ৬৫)। পাণিগ্রহণের পরেও মন্ত্রসংস্কৃতা বালা যদি অক্ষতযোনি হয় তবে তাহার পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত (ঐ ৬৬)।

কাজেই দেখা যায়, শাস্ত্রকারেরা যেমন পুরুষকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীত্যাগের ও পত্ন্যন্তরগ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীকেও পত্যন্তরগ্রহণ ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবে নারীদের অধিকার-ক্ষেত্র পুরুষদের ক্ষেত্র অপেক্ষা সংকীর্ণ।

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে (৩. ২. ৫৯) বলেন, নীচত্বপ্রাপ্ত, পরদেশপ্রস্থিত, রাজকিল্বিষী, প্রাণাভিহন্তা, পতিত বা ক্লীব পতি ত্যাজ্য। পতি বা পত্নী উভয়ের বিবাহবন্ধন ছেদনের ইচ্ছা না থাকিলে বিবাহ রদ হয় না, তবে উভয়েই যদি তাহা চাহে অথবা উভয়েরই যদি পরস্পরে বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে তবে (পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ) বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারে (ঐ ৩. ৩. ৫৯)।

এইসব যে শুধু আইনের কথা তাহা নহে। ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ আছে। সমুদ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন রামগুপ্ত। তাঁহার পত্নী ধ্রুবস্বামিনী রামগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ করেন।[৪৩]

৪৩ দ্র° বাসুদেব অগ্রবাল রচিত 'গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাস'

বিবাহবন্ধন-ছেদনে শাস্ত্রবিধি

এই প্রকরণের কিছু কিছু কথা ব্যবহার-নির্ণয়ের আলোচনা সময়ে আবার পুনরুক্তি করিতে হইবে। উভয় স্থলে এই কথাগুলির প্রয়োজন থাকায় তাহা এড়াইবার উপায় নাই।

বিবাহে কন্যাদোষপ্রসঙ্গে শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, চিররোগ, কুৎসিত রোগ, অঙ্গহীনতা, ধৃষ্টতা, অন্যের সঙ্গে প্রীতি ও অন্যসক্ততা হইয়া থাকিলে সেই কন্যা বিবাহ করিবে না (নারদীয় মনুসংহিতা ১২. ৩৬)। বরেও চিররোগ, কুৎসিত রোগ থাকিলে, উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, দুর্ভাগ্য ও ত্যক্তবান্ধব হইলে তাহা বরদোষ (ঐ ১২. ৩৭)। এইসব দোষ লুকাইয়া বিবাহ দিলে সে বিবাহ বৈধ নহে।

প্রাচীন শাস্ত্রে একটি পুরাতন বিধি আছে, 'নাবীজী ক্ষেত্রমর্হতি' অর্থাৎ যাহার বীজ নাই সে ক্ষেত্র পাইতে পারে না। নারদীয় মনুসংহিতায়ও (১২. ১৯) সেই কথাই পাই।

এইজন্যই দেবণ্ণ ভট্ট বলেন, বিবাহের পূর্বে বর পৌরুষসম্পন্ন কি না তাহা যত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। যাজ্ঞবল্ক্যেরও এই মত। তিনি আরও বলেন, বর যুবা, ধীমান, জনপ্রিয় হওয়া আবশ্যক (আচার, ৩. ৫৫)।

এইসব বিষয়ে অনুমান বা কল্পনার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। রীতিমত বৈজ্ঞানিকভাবে শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনের দ্বারা শরীর ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করাইলে তাহা বিধিসংগত হইবে না। এই কারণেই নারদ বলেন, স্বীয় অঙ্গলক্ষণের দ্বারা পৌরুষ আছে ইহা নিশ্চিতরূপে পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে তবে বিবাহার্থী-পুরুষ কন্যা পাইতে পারে (নারদীয় মনু ১২. ৮)।

এই দৈহিক পরীক্ষায় যাহাতে সব দিকে নজর থাকে সেইজন্য শাস্ত্র নানা দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাই ইহার পর নারদীয় মনুসংহিতায় (১২. ৯-১০) বহু আলোচনা দেখা যায়। পৌরুষের সব অঙ্গ-লক্ষণ দেওয়া আছে, ইহার অভাবে ক্লীব মনে করা উচিত। ক্লৈব্যও যে বহুবিধ হইতে পারে তাহা তাঁহাদের জানা ছিল। তাই তার পর নানাপ্রকারের ক্লৈব্যের কথা নারদীয়

মনুসংহিতায় আছে। কতক ক্লীবত্ব জন্মগত, কতক ইন্দ্রিয়হীনতাবশত, কতক ক্লৈব্য কালগত, কতক ঈর্ষ্যাদিহেতুক, কতক বা সাময়িকভাবে অপগত হয়। কতক ক্লৈব্যে কিছু অদ্ভুতত্ব (abnormality) থাকে, কতক ক্লৈব্যে যথাস্থানে নিষেক হয় না অথবা নিষেকই হয় না, হইলেও সন্তান হয় না। কাহারও পৌরুষ বা নারীর কাছে সংকুচিত, কাহারও বা স্বভার্যায় পৌরুষ হয় না অথচ অন্যত্র হয় (ঐ ১২. ১২. ১৩)। ভাষ্যকার ভবস্বামী বলেন, এইসব ক্লীবত্বের কথা না জানাইয়া যে বিবাহ করে, অথবা বরের এই দোষ জানিয়াও যে কন্যা দেয়, সে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় (ঐ ১২. ১৪. ভাষ্য), কারণ বিবাহসংস্কার জীবনব্যাপী ব্রত ও তাহা সামাজিক দায়িত্ব। তাই এই অপরাধে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়কেই সমাজ ও রাজা শাসন করিতে বাধ্য। তবু যদি কোনো কারণে এইরূপ বিবাহ ঘটিয়া যায়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক মাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্বৎসর প্রতীক্ষা করিবে (ঐ ১২. ১৪)। যদি তাহার পরও বরের এইসব প্রকারের কোনো না কোনো ক্লৈব্য আছে ইহা বুঝা যায় তবে তাহার পরেও সেই বরকে ত্যাগ করিবে, এবং তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না (ভবস্বামী, তত্র)। কোনো কোনো ক্লৈব্যে যে মানসিক (psychological) অদ্ভুতত্ব বা বীজদোষ থাকে সেইরূপ চারি প্রকার ক্লৈব্য-ক্ষেত্রে পতিসমাগম হইয়া থাকিলেও পতিতবৎ পতিকে ত্যাগ করিতে হইবে (নারদীয় মনু, ১২. ১৫)।

সমাগমকালেই এইসব ক্লৈব্য অনেক সময় ধরা পড়ে। তাই সমাগতা হইলেও এইরূপ ক্ষেত্রে কন্যাকে যোগ্য পতির সহিত সংগত করিবে। তাহার অর্থ এইরূপ ক্ষেত্রে পত্যন্তর গ্রহণই বিহিত। বীজে জননশক্তি না থাকিলে এক বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিবে (ঐ ১৬)। নারীতে যদি পৌরুষ সংকুচিত বা নিজ স্ত্রীতে যদি পৌরুষ না হয়, তবে সেই নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে (ঐ ১৭-১৮)। কারণ অপত্যার্থই স্ত্রী সৃষ্ট, সেই ক্ষেত্র বীজবানকেই দিবে; যে বীজহীন সে ক্ষেত্র পাইতে অধিকারী নহে (ঐ ১৯)। এমন স্থলে সেই কন্যাকে পিতাই পুনরায় অন্য বরে দান করিবেন, বা তদভাবে অন্য কোনো গুরুজন দান করিবেন। অথবা হয়তো মাতা বা স্বজাতি কেহ দান করিবেন। ইহাও যদি সম্ভব না হয় তবে রাজার আজ্ঞায় কন্যা স্বয়ংই পতি-বরণ করিবে (ঐ ২০-২২)। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা নাই বলিয়া পত্যন্তরগ্রহণ ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না, কারণ তাহাতে সমাজেরই ক্ষতি।

কাজেই এমন স্থলে সমস্ত সমাজের হইয়া রাজাই সেই কন্যাকে অনুরূপ বরে দিবেন। সবর্ণ, কুল-রূপ-বয়ঃ-শ্রুতাদিতে যে অনুরূপ, সেই বরের সহিত কন্যা বিবাহ-ধর্মাচরণ করিবে এবং তাহার দ্বারা পুত্রাদি উৎপন্ন করাইবে—

সবর্ণমনুরূপং চ কুলরূপবয়ঃশ্রুতৈঃ।
সহধর্মং চরেৎ তেন পুত্রাংশ্চোৎপাদয়েৎ ততঃ। ঐ ১২. ২৩

তবু বীজহীনকে ক্ষেত্র ফেলিয়া দিয়া রাখা চলিবে না, কারণ তাহা সামাজিক ধর্মের বিরোধী। সমাজ চাহে সম্প্রসারণ। এইসব অপরাধে সমাজ ক্রমে সংকুচিত হয়, কাজেই এইরকমের অপরাধ সর্বভাবে দূর করিতে হইবে। যে পুরুষ প্রজাসৃষ্টিতে অক্ষম, সে সমাজের পক্ষে বৃথা ভার মাত্র। তাহার বিবাহকে বিবাহই ধরা হইবে না। এইরূপ বিবাহে সমাজের দুর্গতি দিন দিন বাড়িয়া চলে, কাজেই এইরূপ বিবাহ হইয়া থাকিলেও তাহা অসিদ্ধ।

কেহ যদি বিবাহ করিয়াই কন্যাকে ফেলিয়া দেশান্তরে চলিয়া যায় তখনও তো বীজ থাকিতেও ক্ষেত্রে বীজের অভাব ঘটে। তাই নারদ (১২. ২৪) বলিতেছেন, বরণ করিয়াই যদি কেহ দেশান্তরে যায় তবে তিনটি ঋতুকাল প্রতীক্ষা করিয়া কন্যা অন্য বরকে বরণ করিবে; ঋতু যাহাতে ব্যর্থ না হয় তাই প্রত্যেক ঋতুর কথা কন্যা বান্ধবদের বলিবেন, তাঁহারা যদি তিনটি ব্যর্থ ঋতুর পরেও সেই কন্যাকে অন্য বরের কাছে না দেন তবে তাঁহারাই পাপী হইবেন (ঐ ২৫)।

কন্যার জন্য যদি শুল্ক গ্রহণ করার পর আরও ভালো বর আসে তবে ভদ্রভাবে পূর্ব সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিলেও দোষ হইবে না (ঐ ৩০)। অক্ষতযোনি (ঐ ৪৬), ক্ষতযোনি (ঐ ৪৭) উভয় প্রকারই পুনর্ভূ হইতে পারে। দেবর না থাকিলে অন্য কোনো অসবর্ণ বা সবর্ণের সঙ্গে যদি কন্যার পুনরায় বিবাহ দেওয়া হয় তবে তাহাও পুনর্ভূ (ঐ ৪৮)। পুত্রকামনায় গুরুজনের আজ্ঞায় দেবরকে গ্রহণ করিলে ব্যভিচার দোষ ঘটে না (ঐ ৮০)।

প্রব্রজিত, নষ্ট, ক্লীব, পতিত ও মৃত এই পঞ্চ আপদে নারীদের পত্যন্তর গ্রহণ বিহিত হয় (ঐ ৯৯) ইহা ইঁহারও অভিমত।

পতি প্রোষিত হইলে ব্রাহ্মণ স্ত্রী পতির জন্য আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। সন্তান না হইয়া থাকিলে চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া অন্য পতি সমাশ্রয় করিবে (ঐ ১০০); ক্ষত্রিয়া ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, অপ্রসূতা হইলে তিন বৎসর; বৈশ্যা চারি বৎসর, অপ্রসূতা হইলে দুই বৎসর প্রতীক্ষা করিবে (ঐ ১০১);

শূদ্রাদের কোনো কাল-নিয়ম নাই, ধর্ম-ব্যতিক্রমও নাই। বিশেষতঃ সন্তান না থাকিলে এক বৎসরের পর পত্যন্তরগ্রহণে শূদ্রার কোনো দোষই নাই (ঐ ১০২)। যদি পতির কোনো খবর না পাওয়া যায় তবে এই বিধি। তাহার কোনো খবর-বার্তা জানিলে ইহার দ্বিগুণকাল প্রতীক্ষা করিবে (ঐ ১০৩)। প্রজাপ্রবৃত্তির জন্যই প্রজাপতির সৃষ্টি, তাই এইভাবে সমাজে প্রজা-স্থিতির জন্য অন্য-পুরুষ-গমনে নারীদের কোনো দোষই হয় না (ঐ ১০৪)।

গৌতমও অনুরূপ স্থলে পত্যন্তরগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন (গৌতম সংহিতা, ১৮ অধ্যায়); গৌতম ধর্মসূত্রেও (১৮ অধ্যায়) এই বিষয়ের সমর্থন আছে এবং সেখানে ভাষ্যকার বৃহস্পতিরও সমর্থক-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৪৪]

বসিষ্ঠ সংহিতাও বলেন, স্বামী প্রোষিত হইলে পঞ্চবর্ষ প্রতীক্ষা করিবে। প্রজাতা অর্থাৎ সন্তানবতী হইলে ব্রাহ্মণী পাঁচ বৎসর, ক্ষত্রিয়া চারি বৎসর, বৈশ্যা তিন বৎসর, শূদ্রা দুই বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। ইহার পরে সমানোদক সপিণ্ড সজন্ম স-ঋষি ও সগোত্রের মধ্যে পূর্ব পূর্বই শ্রেষ্ঠ। তাহা প্রাপ্তিতে তাহাকেই পতিরূপে গ্রহণ করিবে। স্বকুলজাত পাইলে পরগামিনী হইবে না।[৪৫]

আনন্দাশ্রম সংস্করণে আর-একটু এইখানে আছে— পঞ্চবর্ষ প্রতীক্ষা করিয়া পতির কাছে প্রোষিত পত্নী যাইবে। যদি ধর্মার্থ বা কামার্থ যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে বিধবার মত ব্রতধারিণী হইয়া প্রতীক্ষা করিবে। প্রজাতা ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা পাঁচ-চার-তিন-দুই বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পরে পতির সমানোদক, সপিণ্ড, সপ্রবর, সগোত্র পত্যন্তর গ্রহণ করিবে। ইহাতে সগোত্র অপেক্ষা সপ্রবর ভালো। তদপেক্ষা সপিণ্ড, তদপেক্ষা সমানোদক ভালো। স্বকুলজাত পাইলে পরগামিনী হইবে না।[৪৬]

---

৪৪ *Mysore Tribes and Castes, Vol II*, পৃ ৩৬০

৪৫ বসিষ্ঠ সংহিতা, মন্মথনাথ দত্ত সংস্করণ, ১৭ অধ্যায়

৪৬ বসিষ্ঠস্মৃতি, আনন্দাশ্রম, ১৭, ৬৭, ৭১

বিবাহবন্ধন-ছেদনে রাজবিধি

ধর্মশাস্ত্র লইয়াই এতদূর আলোচনা চলিল। এখন দেখা যাউক, প্রাচীন রাজ-ব্যবহারে বা আইনে কিরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। এইরূপ আইনের মধ্যে বোধ হয় কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্রই বেশ প্রাচীন এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। কৌটিল্য নামের জন্য কেহ কেহ ইহা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমকালীন, অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ৩২১-৩০০ অব্দের, মনে করিয়াছেন। কামন্দকীয়-নীতিসারে এই গ্রন্থ আখ্যাত। মহামহোপাধ্যায় শাম শাস্ত্রী মনে করেন, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতির যে সংহিতা এখন প্রচলিত, অর্থশাস্ত্র তাহাদের বহু পূর্বে রচিত।[৪৭] আচার্য Winternitz মনে করেন, এই অর্থশাস্ত্র খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের রচনা। তবু তাহা বর্তমান বহু স্মৃতি গ্রন্থেরই পূর্ববর্তী কালের রচিত।

গ্রন্থখানিতে সাংসারিক যুক্তি-বিচারের দিকেই ঝোঁক দেখা যায়। ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়, ধর্মের প্রমাণের দিকে ঝোঁক। গণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদিত কৌটলীয়ের অর্থশাস্ত্র 'বিদ্যাসমুদ্দেশে' (১. ২. ১) সর্বপ্রথমে নাম করিয়াছেন আন্বীক্ষিকী বিদ্যার। আন্বীক্ষিকী বলিতে সাংখ্যযোগ ও লোকায়ত ধরিয়াছেন (পৃ ২৭)। এই বিদ্যা জগতের সর্বাপেক্ষা উপকারিকা (পৃ ২৮)। অথচ এই লোকায়ত মতকে অনেকে নাস্তিক বা হেতুশাস্ত্র বলিয়া খুবই নিন্দা করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (১. ৩০৮) বলেন, রাজাদের উন্নতি ও পতন হইল গ্রহাধীন, তাই গ্রহগণ পূজ্য। অর্থশাস্ত্র বলেন, যেসব লোক নক্ষত্রের উপরই অতিশয় নির্ভর করে তাহারা ছেলেমানুষ অর্থাৎ মূর্খ, কাজেই তাহারা অর্থ বা অভীষ্ট লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। অর্থই হইল অর্থের নক্ষত্র, অর্থাৎ প্রাপ্তির হেতু ; তারকাগুলা আর করিবে কি ?

> নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তং বালমর্থোঽতিবর্ততে।
> অর্থো হ্যর্থস্য নক্ষত্রং কিং করিষ্যন্তি তারকাঃ। অর্থশাস্ত্র-শামশাস্ত্রী, ৯. ৪. ১৪২

ইহাতেও বুঝা যায়, গ্রীকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত গ্রহের ফলাফল-গত

৪৭ *Kautilya's Arthasastra, Intro.* pp. *xvii-xviii* ; *Arthasastra of Kautilya* by Jolly, *Intro.* p. 46

সংস্কার আমাদের দেশে ভালো করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই অর্থশাস্ত্র লিখিত।

অর্থশাস্ত্রে তখনকার দিনের সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায়। কাজেই তখন ভারতে নারীদের অধিকার, দায়প্রাপ্তি বিষয়ে অনেক খবর এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্র নারীদের কোথাও দেবীও বলেন নাই, দানবী বা পিশাচীও বলেন নাই। তখনকার আইনের দৃষ্টিতে নারীদের ভালোমন্দ সবই অর্থশাস্ত্র নিষ্কপটে বলিয়াছেন। আইন যে তখন নারীদের খুব অনুকূল ছিল তাহা নয়। অন্ততঃ অর্থশাস্ত্র তো নারীদের বিশেষ কোনো সুবিধা দেয় নাই। অর্থশাস্ত্র (৩. ২. পৃ ১৫৩) বলেন, নারীদের প্রয়োজন পুত্রের জন্য—

পুত্রার্থা হি স্ত্রিয়ঃ।

নারী যদি অপুত্রা বন্ধ্যা হয় তবে পতি আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবে (পরে অন্য বিবাহ করিতে পারে), যদি স্ত্রী মৃতবৎসা বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী হয় তবে দশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া তার পর অন্য বিবাহ করা চলে (ঐ ৩. ২.)। এই নিয়ম লঙ্ঘনে পূর্বপত্নীকে শুল্ক, স্ত্রীধন এবং অর্ধ আধিবেদনিক দিবে (ঐ)। দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণে পূর্বপত্নীকে যে ধনের দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা হয় তাহার নাম আধিবেদনিক। তাহা ছাড়া চব্বিশ পণ হইবে রাজদণ্ড। এই ক্ষতিপূরণ দিয়া পুরুষ বহু বিবাহ করিতে পারে (ঐ)। স্ত্রী প্রতিকূল আচরণ করিলে স্বামী তাহাকে তিরস্কার ও দৈহিক দণ্ডও দিবার অধিকারী (ঐ ৩. ৩. পৃ ১৫৫)।

তবু এই অর্থশাস্ত্রই বিবাহাতিরিক্ত নারীগমনপ্রসঙ্গে অর্থাৎ ব্যভিচার বিষয়ে বারবার বলিয়াছেন, 'অকামা' অর্থাৎ অনিচ্ছুক নারীকে গমন করিবে না—

ন চ প্রাকাম্যমকামায়াং লভেত। ঐ ৪. ১২. পৃ ২২৯ ; ঐ, পৃ ২৩০

সবর্ণা হইলে উভয়ের সম্মতি থাকিলে এবং যৌবনপ্রাপ্তির পরে তিন বৎসরের পর অভিমত-পুরুষের সহিত নারী চলিয়া যাইতে পারে (ঐ পৃ ২২৯)। নারী যদি অলংকার সঙ্গে না নেয় তবে তিন বৎসরের পর অসবর্ণ পুরুষের সঙ্গেও গেলে আইনত দোষ নাই (ঐ)। কন্যার পিতৃদত্ত কিছু সঙ্গে লইয়া গেলে তাহা

চুরি বলিয়া গণ্য হইবে (ঐ)। গণিকার কন্যাকে নষ্ট করিলেও পুরুষ দণ্ডনীয় (ঐ পৃ ২৩৩)। দাসদাসীর কন্যাকে নষ্ট করিলে পুরুষ দণ্ডার্হ এবং সেই কন্যার বিবাহের শুল্ক ও স্ত্রীধন দিতে বাধ্য (ঐ)। নিষ্ক্রয়ানুরূপ দাসীগমনে পুরুষ দণ্ড্য ও ভরণপোষণ করিতে বাধ্য থাকিবে (ঐ)। স্বামী বিদেশে থাকিতে যদি পতিবন্ধু বা পরিজন নারীকে নষ্ট করে, তবে পতি আসিয়া যদি তাহাতে আপত্তি না করে তবে দণ্ড হইবে না, নচেৎ কঠিন দণ্ড হইবে (ঐ)।

যদি নারীকে অরণ্যে, বন্যায়, দুর্ভিক্ষে বা শ্মশানে কেহ রক্ষা করে অথবা শত্রুহস্ত হইতে কেহ উদ্ধার করে, তবে নারীর সম্মতি থাকিলে সেই পুরুষ নারীকে উপভোগ করিতে পারে (ঐ পৃ ২৩১)। তবে নারী উচ্চজাতীয়া, পুত্রযুক্তা এবং অনিচ্ছুক হইলে এই উপকারের জন্য সে কিছু অর্থমাত্র পাইতে পারে (ঐ)।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়কে যখন না চাহে তখন বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। একপক্ষ শুধু বিবাহবিচ্ছেদ চাহিলেই চলিবে না (ঐ ৩. ৩. পৃ ১৫৫)। স্ত্রীর হাতে সে বিপন্ন হইতে পারে মনে করিয়া যদি পুরুষ বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে চাহে তবে তাহাকে স্ত্রীর কাছে গৃহীত ধন ফিরাইয়া দিতে হইবে (ঐ)। নারীও এইরূপ বিবাহে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে চাহিলে স্বামীর দত্তধন ফিরাইয়া দিবে (ঐ)। এইসব ব্যবস্থা দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অর্থশাস্ত্র বলেন, ধর্মবিবাহে পরস্পরে ছাড়াছাড়ি নাই। একই সঙ্গে এই দুই কথা বলায় মনে হয়, ধর্মবিবাহকে আদর্শের দিক দিয়া অর্থশাস্ত্রকার অচ্ছেদ্য বন্ধন মনে করিতেন। তবে সংসারে ও সমাজে তো ধর্মই একমাত্র নিয়ন্তা নহে, অন্য নানা রকম অবস্থা দেখিয়া এবং সামাজিক রীতিনীতি আলোচনা করিয়া শাস্ত্রকারকে সমাজব্যবস্থা বা আইন করিতে হইয়াছে। এই কারণেই তিনি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধনও ছিন্ন করা যায় তাহা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, কেহ কাহাকেও না চাহিলে তখন বিবাহবন্ধন-ছেদন না করিয়া উপায় কি ?—

পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ। ঐ

দুই জনের মধ্যে একজনেরও যদি বিবাহবন্ধন-ছেদনে অনিচ্ছা থাকে তবে এই বন্ধন ছিন্ন করা চলিবে না (ঐ)। আইনের চক্ষে ষোলো বছরের ছেলে আর বারো বছরের মেয়ে হইলেই তাহারা আইনের সহায়তা পাইতে

পারে (ঐ পৃ ১৫৪)। তৃতীয় অধিকরণের তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থশাস্ত্র ছেলে ও মেয়ের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে যতগুলি অপরাধ আইনের চক্ষে দণ্ডনীয়, তাহা দেখাইয়াছেন।

অর্থশাস্ত্র বলেন, বিবাহ অনুষ্ঠান না হইয়া থাকিলে বিবাহ সম্পর্কীয় আইন খাটিবে না। এবং মেয়ের বারো বৎসর ও ছেলের ষোলো বৎসর হইয়া থাকিলেও বিবাহ না হইয়া থাকিলে তাহারা নাবালকমাত্র। এইসব বিষয়ে তাহাদের কোনো কথা চলিবে না (ঐ ৩. ২. পৃ ১৫১)। অর্থশাস্ত্রের মতে আট প্রকার বিবাহের মধ্যে কন্যাকে অলংকৃত করিয়া দান করিলে তাহা ব্রাহ্মবিবাহ (ঐ)। সহধর্মচর্যা হইল প্রাজাপত্য বিবাহ (ঐ)। গো-মিথুন গ্রহণ করিয়া কন্যাদান হইল আর্ষ (ঐ)। যজ্ঞে ঋত্বিক, পুরোহিতকে কন্যাদান হইল দৈব (ঐ)। স্ত্রীপুরুষের অনুরাগবশতঃ পরস্পরের মিলন হইল গান্ধর্ব (ঐ)। পণ লইয়া কন্যাদান হইল আসুর (ঐ)। বলপূর্বক কন্যা হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইল রাক্ষস (ঐ)। এবং সুপ্তা প্রমত্তা কন্যা লইয়া যাওয়া হইল পৈশাচ (ঐ)। ইহার মধ্যে প্রথম চারিপ্রকার বিবাহ হইল সর্বসম্মত ও ধর্মসংগত। ইহাতেও পিতার সম্মতি চাই—

পিতৃপ্রমাণাশ্চত্বারঃ পূর্বে ধর্ম্যাঃ। ঐ

বাকি চাররকম বিবাহে পিতামাতা উভয়ের সম্মতি চাই—

মাতৃপিতৃপ্রমাণাঃ শেষাঃ। ঐ পৃঃ ১৫২

ইহার পরই অর্থশাস্ত্র স্ত্রীধনের কথা বলেন, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

বিবাহবন্ধন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই মান্য, একথা সত্য। তবু যদি দেখা যায় স্বামী দুশ্চরিত্র, পতিত, স্ত্রীকে বধ করিতে উদ্যত, রাজার বিরুদ্ধে অপরাধী, ক্লীব বা বিদেশপ্রস্থিত হয় তবে কন্যাকে আবার বিবাহের অধিকার দিতে হইবে (ঐ ৫৯, পৃ ১৫৪)। এখানে রাজা মানে দেশ বা রাষ্ট্র। কারণ তখন ভালোমন্দ কল্যাণ-অকল্যাণের প্রত্যক্ষ বিগ্রহই ছিলেন রাজা।

যদি পতি হ্রস্বপ্রবাসী হয় অর্থাৎ অল্পকালের জন্য বিদেশ যাত্রা করিয়াও না ফেরেন তবে শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ভার্যাগণ প্রজাতা অর্থাৎ সন্তানবতী না হইয়া থাকিলে বৎসরেক কাল প্রতীক্ষা করিবেন। প্রজাতা অর্থাৎ সন্তানবতীগণ সম্বৎসরের অধিককাল প্রতীক্ষা করিবেন—

হ্রস্বপ্রবাসিনাং শূদ্রবৈশ্যক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণানাং
ভার্যাস্‌সংবৎসরোত্তরং কালমাকাঙ্ক্ষেরন্‌ অপ্রজাতাঃ
সংবৎসরাধিকং প্রজাতাঃ। ঐ পৃ ১৫৮

যদি পতিরা স্ত্রীদের ভরণপোষণের প্রতিবিধান করিয়া বিদেশে গিয়া থাকেন তবে তাঁহারা ইহার দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেন—

প্রতিবিহিতাঃ দ্বিগুণং কালম্‌। ঐ

ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিয়া গিয়া থাকিলে সম্পন্ন জ্ঞাতিগণ চার বা আট বৎসর সেই প্রোষিতার স্ত্রীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবেন—

অপ্রতিবিহিতাঃ সুখাবস্থা বিভৃয়ুঃ পরং চত্বারি বর্ষাণ্যষ্টৌ বা জ্ঞাতয়ঃ। ঐ, ২৮

তাহার পর পতিকুল হইতে প্রাপ্ত ধন স্ত্রীগণের নিকট আদায় করিয়া জ্ঞাতিগণ তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য মুক্তি দিবেন—

ততো যথাদত্তমাদায় প্রমুঞ্চেয়ুঃ। ঐ ২৯

অধ্যয়নার্থ বিদেশগত ব্রাহ্মণের অপ্রজাতা পত্নী দশ বৎসর এবং প্রজাতা পত্নী দ্বাদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিবেন। স্বামী যদি রাজপুরুষ হন এবং রাজকার্যে বিদেশে গিয়া থাকেন তবে আয়ুক্ষয় পর্যন্ত পত্নী প্রতীক্ষা করিবেন—

ব্রাহ্মণমধীয়ানং দশবর্ষাণ্যপ্রজাতাঃ দ্বাদশ প্রজাতাঃ। রাজপুরুষমায়ুঃক্ষয়াদাকাংক্ষেত। ঐ পৃ ১৫৯

তবে ইতিমধ্যে স্বজাতি কোনো পুরুষের ঔরসে যদি তাহার সন্তান হয় তবে সেই স্ত্রী অপবাদভাগিনী হইবে না—

সবর্ণতশ্চ প্রজাতা নাপবাদং লভেত। ঐ

কারণ, হয়তো বংশলোপভয়েই সেই স্ত্রী স্বজাতির দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইয়া থাকিবেন। কিন্তু যদি প্রোষিতার পত্নীর জ্ঞাতিকুটুম্ব না থাকেন, অথবা সম্পন্ন জ্ঞাতিরা ভরণপোষণ না দিয়া ছাড়িয়া দেন অথবা ভরণপোষণের উপযুক্ত সম্পদও যদি তাঁহার না থাকে, তবে তিনি ভরণপোষণসমর্থ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন,

কুটুম্বর্ধিলোপে বা সুখাবস্থৈর্বিমুক্তা যথেষ্টং বিন্দেত। ঐ

অর্থশাস্ত্র যদিও পূর্ব-অধ্যায়েই সাধারণভাবে বলিয়াছেন, ধর্মবিবাহে বন্ধন ছেদন হয় না, তবু এখন বিশেষস্থলে বলিতেছেন, ধর্মবিবাহে পরিগৃহীতা কুমারী

যদি আপদ্‌গতা এবং তাঁহার পতি কিছু না বলিয়া কহিয়া, কোনো ব্যবস্থা না করিয়া, বিদেশগত হন তবে পতির খবর-বার্তা পাওয়া গেলে সেই স্ত্রী পতির জন্য সপ্তঋতুকাল প্রতীক্ষা করিবেন। আর যদি পতি বলিয়া কহিয়া গিয়া থাকেন এবং তাঁহার খবরাখবর পাওয়া যায় তবে সম্বৎসর প্রতীক্ষা করিবেন—

জীবিতার্থমাপদ্‌গতা বা ধর্মবিবাহাৎ কুমারী পরিগৃহীতারমনাখ্যায় প্রোষিতং শ্রূয়মাণং
সপ্ততীর্থান্যাকাংক্ষেত। সংবৎসরং শ্রূয়মাণম্। ঐ

বিদেশগত পতির খবরবার্তা না পাইলে পঞ্চঋতুকাল প্রতীক্ষা করিবে, খবরবার্তা পাওয়া গেলে দশঋতুকাল—

আখ্যায় প্রোষিতমশ্রূয়মাণং পঞ্চতীর্থান্যাকাঙ্ক্ষেত। দশ শ্রূয়মাণম্। ঐ

বিবাহশুল্কের যদি অংশমাত্র দিয়া পতি বিদেশে গিয়া থাকেন এবং খবর না পাওয়া যায়, তবে তিনঋতুকাল, আর খবর পাইলে সপ্তঋতুকাল প্রতীক্ষা করিবে—

একদেশদত্তশুল্কং ত্রীণিতীর্থান্যশ্রূয়মাণম্।
শ্রূয়মাণং সপ্ততীর্থান্যাকাংক্ষেত। ঐ ৩৭-৩৮

পুরাপুরি শুল্ক দিয়া থাকিলে খবরবার্তা-না-পাওয়া বিদেশগত পতির জন্য পঞ্চঋতুকাল, খবর পাওয়া গেলে দশঋতুকাল প্রতীক্ষা করিবে—

দত্তশুল্কং পঞ্চতীর্থান্যশ্রূয়মাণম্। দশ শ্রূয়মাণম্। ঐ

তাহার পরে ধর্মাধিকারিগণের অনুমতি লইয়া ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিবে—

অন্ততঃ পরং ধর্মস্থৈর্বিসৃষ্টা যথেষ্টং বিন্দেত। ঐ

তথাপি ঋতুকালকে উপেক্ষা করা চলিবে না। কারণ সন্তান হওয়াই হইল সমাজ-ব্যবস্থার কাম্য। এখানে পূর্বে উক্ত 'নাবীজী ক্ষেত্রমর্হতি' এই চিরাগত সামাজিক সত্যটি স্মরণীয়। তাই অর্থশাস্ত্রকার বলেন, 'তীর্থোপরোধ' অর্থাৎ ঋতুস্নানকে উপেক্ষা করাই হইল ধর্মবধ—

তীর্থোপরোধো হি ধর্মবধ ইতি কৌটিল্যঃ। ঐ

পতি দীর্ঘকাল বিদেশগত, প্রব্রজিত বা মৃত হইলে ভার্যা সপ্তঋতুকাল প্রতীক্ষা করিবে। পুত্রবতী ভার্যা সম্বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। তাহার পর পতির সহোদরকে বিবাহ করিবে। পতির যদি বহু ভ্রাতা থাকে তবে যে প্রত্যাসন্ন

(নিকটতম), ধার্মিক এবং ভরণে সক্ষম, অথবা যে কনিষ্ঠ ও ভার্যাহীন তাহাকেই বিবাহ করিবে। পতির এমন ভাই না থাকিলে সপিণ্ডকে বিবাহ করিবে বা স্বামীর কুলজাত আসন্নকে (সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে) বিবাহ করিবে। ইহাই হইল বিহিতক্রম—

দীর্ঘপ্রবাসিনঃ প্রব্রজিতস্য প্রেতস্য বা ভার্যা সপ্ততীর্থান্যাকাংক্ষেত। সংবৎসরং প্রজাতা। ততঃ পতিসোদর্যং গচ্ছেৎ। বহুষু প্রত্যাসন্নং ধার্মিকং ভর্মসমর্থং কনিষ্ঠমভার্যং বা। তদভাবেপ্যসোদর্যং সপিণ্ডং কুল্যং আসন্নম্। এতেষাং এব এব ক্রমঃ।

পতির এইসব দায়াদগণকে (আত্মীয়গণকে) লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো নারী বিবাহ করে তবে সে ক্রম ও বিধি লঙ্ঘন করে। এমন স্থলে বিবাহকারী বরকন্যা, বিবাহদাতা ও যাহারা তাহাতে সম্মতি দেয় তাহারা সকলেই অবৈধ স্ত্রীপুরুষ-মিলনের অপরাধে দণ্ডনীয়—

এতানুৎক্রম্য দায়াদান্ বেদনে জারকর্মণি।
জারস্ত্রী-দাতৃবেত্তারঃ সংপ্রাপ্তাঃ সংগ্রহাত্যয়ম্। গণপতি শাস্ত্রীর
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, II, ৬১অ, পৃ ৩০

ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদেও বিধবার পুনর্বিবাহের প্রথা দৃষ্ট হয়। অথর্বে 'পুনর্ভূ' বিবাহব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সেই দ্বিতীয় পতির সঙ্গে বিয়োগ না ঘটে সেজন্য অথর্বে 'অজপঞ্চৌদন'দান ব্যবস্থাও দেখা যায়। বোধায়ন ধর্মসূত্রে (২. ২. ২৭) পতিত ও ক্লীবকে ত্যাগ করিয়া পত্যন্তর-বেদনের ব্যবস্থা আছে। বসিষ্ঠের ব্যবস্থাও দেখানো গেল। নারদীয় মনু প্রাচীন সংগ্রহ, তাহারও ব্যবস্থা দেখানো গেল। তার পর অর্থশাস্ত্রের সব ব্যবস্থাও দেখানো গেল। অর্থশাস্ত্রও ধর্মবিবাহকে একটা জীবনব্যাপী সংস্কার মনে করেন। তথাপি তীর্থোপরোধ অর্থাৎ ঋতুকালের উপেক্ষাকে ধর্মবধ মনে করা উচিত, ইহাই তাঁহার মূল কথা। তাই যেখানে যেখানে বিশেষ বিশেষ স্থলে পত্যন্তর গ্রহণ বিধেয় তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন।

বিধি যাহাই থাকুক, নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইল এক পতি লইয়া ঘর করা। বহুবিবাহ পুরুষ বা নারীর উভয়েরই হইতে পারে। পুরুষের বহুবিবাহকে ইংরেজিতে পলিগ্যামি বলে। নারীর বহুবিবাহকে পলিআণ্ড্রি বলে। পলিগ্যামি বহুদেশেই ছিল এখনও আছে, তবে এই বিষয়ের ব্যভিচার চলে কোথাও প্রকাশ্যভাবে, কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, আর

কোথাও নানা ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া। এরূপ স্থলে পুরুষকে বিধাতা কোনো দায় দেন নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নারীকে ভগবান মাতৃত্ব দিয়া সংযত করিয়া দিয়াছেন। বিধাতার এই দানের সম্মান প্রায়ই নারীরা রক্ষা করিয়াছেন। তবে তাহার ব্যতিক্রম যে হয় না তাহাও নহে।

দক্ষিণভারতের নায়ার-নারীরা সামাজিক বিধানের বলে এবং তাঁহাদের নিজেদের সনাতন রীতি অনুসারে জীবনের সঙ্গী নির্বাচন বিষয়ে স্বাধীন। একটা নামমাত্র আনুষ্ঠানিক বিবাহ তাঁহাদের জীবনের প্রথম দিকে হয়। তাহার পর সেই কন্যা সবর্ণ বা উচ্চতরজাতীয় যাহার সহিত ইচ্ছা বাস করিতে পারেন। তবে সেই পুরুষ হীনজাতীয় হইলে লজ্জার কথা। এতটা স্বাধীনতা পাইয়াও নায়ার-কন্যারা একবার-নির্বাচিত একজনকে লইয়াই ঘর করেন[৪৭ক]। একই সঙ্গে বহুজনকে লইয়া থাকিলেও তাহা তাঁহাদের সামাজিক ও সনাতন-রীতিতে হয়তো বাধে না। কিন্তু তাহা ঘটিতে দেখা যায় না।

সেখানে যাঁহার সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠান করা হয় তাঁহার সঙ্গে বসন ছিন্ন করিয়া বিবাহবিচ্ছেদ সাধিত হয়।[৪৮]

নম্বুদ্রী-ব্রাহ্মণদের মধ্যে এতকাল বড় ভাই মাত্র বিবাহ করিতে পারিতেন। অন্য ভাইয়েরা নায়ার কন্যাদের লইয়াই থাকিতেন। নায়ার কন্যারা নামেমাত্র বিবাহিত হইতেন নায়ারদের সঙ্গে, কিন্তু বাস করিতেন অবিবাহিত নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে। ইহাতে নায়ার পুরুষরা পাইতেন না স্ত্রী, এবং নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণকন্যারা পাইতেন না পতি। এই প্রথা দেশকে দূষিত করিতে লাগিল। তবু যাঁহারা এই প্রথা দূর করিয়া নায়ার পুরুষের সঙ্গে নায়ার কন্যার, এবং নম্বুদ্রী পুরুষের সঙ্গে নম্বুদ্রী কন্যার যথাশাস্ত্র বিবাহ ও একত্র ঘর-করার প্রস্তাব করিলেন, তাঁহারা সেই দেশের সনাতনীদের দ্বারা খুবই তিরস্কৃত ও অপমানিত হইলেন। কারণ সেই দেশে এইরূপ ব্যভিচারই সনাতনী অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথা। জস্টিস্ শঙ্কর নায়ারকে এজন্য কম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। ব্যভিচারও যদি পুরাতন হয় তবে তাহাই পূজ্য, এবং শুচিতা ও সংযম যদি নূতন হয় তবে তাহাও অগ্রাহ্য। এইরূপ সংস্কারই আমাদের

৪৭ক Thurston and Rangachari, *Castes and Tribes of Southern India, Vol. V*, পৃ ৩০৮

৪৮ ঐ, p. 315

অস্থি-মজ্জায় বিরাজমান। আসলে দেখা যায় আমরা শাস্ত্র মানি না, প্রথাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান।

এ দিকে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণকন্যারা পতিলাভে বঞ্চিতা, তবু তাঁহাদের মধ্যে যতটা ব্যভিচার ঘটিতে পারিত ততটা দেখা যায় না। তবু এইরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থায় অনেক ব্রাহ্মণকন্যা যে বিপথগামিনী হইতে বাধ্য হন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? সকলেই যে নষ্ট হন না ইহাই বিস্ময়কর।

যেসব নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণকন্যা এইভাবে পথভ্রষ্ট হন তাঁহারা আর নম্বুদ্রীদের শুদ্ধান্তঃপুরে স্থান পান না। তাঁহাদের দুঃখদুর্গতির আর অবধি ছিল না। অবশেষে চেরাক্কলের রাজা ইহাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাল্লিপরম্ব নামে একজন লোককে এইজন্য অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া এইসব ব্রাহ্মণকন্যাকে আশ্রয় দিবার ভার দিলেন। অবশ্য তাঁহার আশ্রয়ে থাকা না থাকা কন্যাদের ইচ্ছা। এইজন্য সেই লোকটি 'মান্নানার' উপাধি ও সম্মান পাইল। মান্নানারের বাড়ির চারিদিকে তাহার এতদর্থে প্রাপ্ত বিরাট ভূসম্পত্তি। লোকেরা পথভ্রষ্টা ব্রাহ্মণকন্যাকে মান্নানারের বাড়ির কাছে রাখিয়া আসে। তাহার বাড়ির চারিদিকে প্রাচীর। একটি তোরণ পূর্ব দিকে, একটি উত্তর দিকে। যদি কন্যা ইচ্ছা করিয়া পূর্ব তোরণ দিয়া প্রবেশ করে তবে সে মান্নানারের পত্নীদের মধ্যে গণিত হয়, আর যদি সে উত্তরের তোরণ দিয়া প্রবেশ করে তবে সে মান্নানারের ভগ্নীশ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হয়। অবশ্য এই নিয়ম এখন আর পূর্বের মত ঠিকভাবে চলে না।[৪৮ক]

এই মান্নানারেরা জাতিতে তিয়া। তিয়ারা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতি। তাড়ি প্রস্তুত করাই তাহাদের ব্যবসা। ইহাদের মেয়েরা অনেকে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে এতকাল ঘর করিত। এখন ক্রমশঃ তাহা বন্ধ হইয়া আসিতেছে।[৪৯] তিয়ারা নায়ারদের ধোপার কাজও করে। নায়ার-নারীরা ঋতুমতী হইলে তিয়ার কাছে সেই বস্ত্র না দিলে এবং তিয়াদের দ্বারা ধৌত বস্ত্র না পরিলে শুচি হন না। এই অস্পৃশ্য তিয়াজাতির লোক ছাড়া বিপথগামিনী ব্রাহ্মণ-কন্যাদের স্থান দিতে আর কেহই রাজি হয় নাই।

৪৮ক *Castes and Tribes of Southern India, Vol. V*, পৃ ২২৪-২২৫

৪৯ ঐ, Vol. VII. পৃ ৩৬.।

নানা সংস্কৃতির মিলন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আর্যদের মধ্যে নারীদের যতটা অধিকার ছিল দ্রবিড়দের মধ্যে ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি। দ্রবিড়দের মধ্যে নারীদেরই প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল। সংসারে ও পরিবারে মাতৃতন্ত্রতাই ছিল দ্রবিড়দের নিয়ম। নারীরা স্বেচ্ছাপূর্বক পুরুষ-নির্বাচন করিয়া ঘর করিতেন। এইসব কারণে পুত্রগত বংশ ও অধিকার না হইয়া তাঁহাদের মধ্যে চলে কন্যাগত বংশ ও অধিকার। মহাভারতের (সভা, ৩১ অধ্যায়) মধ্যে সহদেব-দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মাহিষ্মতী পুরীর বিবরণ দেখিলে বুঝা যায়, নারীদের সেখানে কতখানি স্বাধীনতা ছিল। অগ্নি নাকি তাঁহাদের স্বৈরিণী হইবারও অধিকার দেন, তাই মাহিষ্মতীর নারীরা শাস্ত্রাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহেন, তাঁহারা অপ্রবারিতা (সভা ৩১. ৩৮)।

যখন সেখানে আর্যদের যাগযজ্ঞ গেল তখন অগ্নি জ্বালাইবার ভার পড়িল সেই দেশে মেয়েদেরই উপর (সভা ৩১. ২৯)। অথচ আর্যদের মধ্যে যজ্ঞাগ্নি পুরুষ পুরোহিতেরই জ্বালাইবার কথা। হয়তো সেই দেশে দেবমন্দিরে তখন নারীরাই পুরুষের কাজ করিতেন। পুরুষেরা নহে। দেবমন্দিরে নৃত্যগীতের দ্বারা পূজা হইত। ক্রমে আর্যসভ্যতা সেই দেশে গেলে ব্রাহ্মণেরা দেবারাধনার কাজ ধীরে ধীরে অধিকার করিলেন, ক্রমে ক্রমে শুধু নৃত্যগীতটুকু এখন দেবদাসীদের উপর রহিয়া গিয়াছে। একটা বড় অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাই সেখানে নারীদের স্থিতি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ঘৃণিত হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র বিরাট বলিয়াই সদা শুচি, ডোবা সংকীর্ণ বলিয়াই পচিয়া ওঠে। এইজন্য সব দেশেই বৃহৎ ক্ষেত্র ও অধিকার হইতে বঞ্চিত পুরুষ বা নারী গভীরতর দুর্গতির দিকে চলিতে থাকে। সেই কারণেই উদার স্বাধীনতার জন্য যুগে যুগে প্রাণ দিয়া নরনারীগণ বীরের সদ্গতি বরণ করিতে চাহিয়াছেন।

দ্রবিড়-কন্যাদের যেসব অধিকার পূর্বকালে ছিল তাহা হারাইয়া আজ তাঁহারা পূর্বতন মাহাত্ম্য হইতে ভ্রষ্ট। তবু তাঁহাদের সামাজিক রীতিনীতি আমাদিগকে শ্রদ্ধার সহিতই আলোচনা করিতে হইবে।

আর্যেতর জাতির মধ্যেও নানা ভাগ ও ভালোমন্দ নানারকমের সংস্কৃতি ছিল। আর্যদের বৈদিক প্রাচীন যাগযজ্ঞ ছিল কামনামূলক। "স্বর্গকামো যজেত"

অর্থাৎ স্বর্গ-কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। যজ্ঞের জন্য চাই হিংসা। তাই বৈদিক কর্মকাণ্ড কামনায় ও জীবহিংসায় কলুষিত ছিল।

আর্যেতর প্রভাবের ফলে ক্রমে আর্যেরা যে হিংসা ছাড়িয়া অহিংসার মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন সে কথা পূর্বে একটু বলা হইয়াছে। কামনামূলক স্বর্গাদি ছাড়িয়া ক্রমে আর্যেরা নিষ্কামধর্মের ও বৈরাগ্যের জয়গান করিতে লাগিলেন। হিংসাময় যজ্ঞের স্থলে ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম প্রচার করিতেই অবতারেরা আসিলেন। আর অবতারবাদের ফলে দেবতাদের স্থান ক্রমে অধিকার করিলেন মানুষ। মধ্যযুগের সন্তদের বাণীতে দেখা যায়, 'ভক্তি দ্রবিড় দেশে উৎপন্ন'। পদ্মপুরাণেও (উত্তরখণ্ড ৫০. ৫১) দেখি, ভক্তি দ্রবিড়দেশে উৎপন্না। কাজেই আর্যেরা ক্রমে ক্রমে আর্যেতর নানাবিধ উত্তম উত্তম সংস্কৃতির দ্বারাই পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। আর্যেতর সংস্কৃতির একদল যেমন নারীদের স্বেচ্ছাচার ও অপ্রতিবারণ-বিধি মানিত (মহাভারত, সভা ৩১ অধ্যায়[১], তেমনি আর-একটা উচ্চতর সংস্কৃতি ছিল বৈরাগ্য, নিষ্কামধর্ম, সন্ন্যাস, কামনাজয় প্রভৃতির উপাসক। আর্যেরা কিন্তু প্রথমে বৈরাগ্যবাদী ছিলেন না। তাঁহাদের ঋষিরা ছিলেন বিবাহিত, অনেকের বহু পত্নীও ছিলেন। স্বয়ং মনুর দশটি পত্নীর কথা আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু জৈন-বৌদ্ধ আদর্শ ও বৈষ্ণব-ভাগবত আদর্শ হইল সন্ন্যাসের অনুকূল। আর্যেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন যেন বংশ-বিস্তার-বিরোধী এই সন্ন্যাসধর্ম তাঁদের না পাইয়া বসে। তাই তাঁহারা সন্ততিরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জরৎকারু ছিলেন তপঃপরায়ণ। বিবাহ না করায় তাঁহার সন্তান হয় নাই, তাই তাঁহার পিতৃগণ অধোগামী হইলেন। অবশেষে তপস্যা ছাড়িয়া জরৎকারু নাগকন্যাকে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করিলেন। পিতৃগণ আর অধোগামী হইলেন না (আদি ৪৫)। মন্দপাল ঋষি তপস্যার দ্বারা গতিলাভ করিতে না পারিয়া অগত্যা তির্যক-কন্যাকে বিবাহ করিয়া নিরয় হইতে রক্ষা পাইলেন (আদি ২২৯)।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বংশরক্ষা করার দিকে আর্যেরা অত্যন্ত সাবধান রহিলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেও যাহাতে সকলে গৃহধর্ম পালন করেন তাহার জন্য অনুশাসন রহিল। ক্রমে সবদিক বজায় রাখিবার জন্য চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা হইল। তাহার প্রথমটা হইল গৃহস্থজীবনের, তাহার জন্য শিক্ষার কাল হইল ব্রহ্মচর্য। আর শেষটা হইল সন্ন্যাসের, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার কাল

হইল বানপ্রস্থ। মোট কথা, জীবনের বারো আনা অর্থাৎ চার আশ্রমের তিনটি আশ্রমই তপস্যা হইয়া উঠিল। শুধু দ্বিতীয় আশ্রমটি গৃহস্থাশ্রম রহিল। যাগযজ্ঞের স্থলে প্রবর্তিত হইল অহিংসা, ভক্তি, যোগ, সাধনা, শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্যাদির সাধন।

কিন্তু ক্রমে চতুরাশ্রমের এই আদর্শও শক্তিহীন হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণাদি সকলেই এখন চারি আশ্রমের স্থলে একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই পালন করেন। দক্ষিণভারতে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে শুধু কতক লোক এখনও ব্রহ্মচর্য পালন করেন। উত্তরভারতে আর্যসমাজ গুরুকুল স্থাপন করিয়া বিরাট দেশের মধ্যে জনকয়েককে মাত্র ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করেন। আরও দুই-একটি প্রতিষ্ঠান এখন ব্রহ্মচর্যের দিক্ষা দিতে চাহেন। সে ব্রহ্মচর্যও প্রাচীনকালের তুলনায় কি, তাহা দেখিলেই সকলে বুঝেন। পুরুষগণ এখন চারি আশ্রম ঘুচাইয়া গৃহী হইয়াই সারাজীবন কাটাইতেছেন।

পূর্বকালে বিধবা নারীদের মধ্যেও অনেকেই আবার বিবাহ করিতেন। আর্যদের মধ্যে তপস্যা ও বৈরাগ্য প্রচারের পর, পুরুষদের চতুরাশ্রমের প্রথা চলিল। উচ্চজাতীয় নারীদের মধ্যেও এক বিবাহের পর আর পত্যন্তরগ্রহণপ্রথা রহিল না। বিধবা হইলেই নারীরা ব্রহ্মচারিণী হইতেন ও ব্রহ্মচারিণীর মত মাথা মুণ্ডিত করিয়া থাকিতেন। ইহাতে কতকটা জৈন সাধ্বী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর ভাব দেখা যায়। বাংলাদেশ ছাড়া উত্তর-ভারতে বিধবার এতটা কৃচ্ছ্রাচার নাই। বাংলাদেশে অনেকটা দক্ষিণ-ভারতের মত বিধবার আচার। নঞ্জুনদায়্যা এবং অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার বলেন, পতির মৃত্যুর একাদশ দিনে নারীকে মাথা মুণ্ডন করাইয়া এক বৎসর নির্জনে বাস করিতে হয়। তার পর শ্বেতবসনা তপস্বিনী হইয়া থাকিতে হয়। বিবাহাদি মঙ্গলকর্মে বিধবারা যোগ দিতে পারেন না। খাটে শোওয়া, থালায় খাওয়া, তাম্বুল-গন্ধপুষ্পাদি ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বিধবাগণের যতিধর্ম পালন করিতে হয়। বেদে তো বিধবার মুণ্ডনের কথা নাই। প্রাচীন স্মৃতিগুলিতেও নাই। আপস্তম্ব, বসিষ্ঠ, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য ও মহাভারতেও নাই। কেশমুণ্ডন সমর্থনে স্কন্দপুরাণ ও ব্যাসস্মৃতি মাত্র প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয়।[৫০]

৫০ *Mysore Tribes and Castes*, vol. II, পৃ ৪৮৬-৪৮৭

পুরুষেরা এখন চতুরাশ্রম ছাড়িয়া আরামে সংসারে থাকিতে পারেন, কিন্তু বিধবাদের মধ্যে যে যতিব্রত আসিয়াছিল তাহার আর পরিবর্তন ঘটিল না। শাস্ত্রানুসারে উপনীত পুরুষমাত্রেরই একাদশী ব্রত পালনীয়। নারীর মধ্যে তাহা শুধু বিধবাদের করণীয়। সধবারা উপবাসে বাদ পড়িয়াছেন, কারণ গর্ভে বা কোলে শিশু থাকিতে পারে। এখন পুরুষেরাও সরিয়া গিয়াছেন, মাত্র বিধবাদেরই একাদশী পালনীয়।

অম্বুবাচী ব্রত তো 'যতিব্রতী বিধবা' অর্থাৎ সব পুরুষ ও বিধবার পালনীয়। কিন্তু পালন করিতে দেখা যায় একমাত্র বিধবাদেরই।

যেসব ব্যবস্থা আর্যেতর সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া আর্যগণ করিয়াছিলেন, সেইসব তপস্যা ও কৃচ্ছ্রাচারের ব্যবস্থা পুরুষেরা ধীরে ধীরে ছাড়িয়াছেন। সবই আছে এখন বিধবার উপরে চাপিয়া।

এইসব আচার ও যতিধর্ম উচ্চবর্ণের বিধবারাই পালন করিতেন। সংখ্যায় উচ্চবর্ণের লোক কম। বাংলাদেশের সাধারণ লোকের মধ্যে এতকাল বিধবারা মাছ খাইতেন ; দুই বেলা খাইতেন। অনেকে পুনরায় বিবাহও করিতেন। এখন সকলেরই চেষ্টা উচ্চতর বর্ণের শামিল হইবার জন্য। কাজেই যাঁহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ছিল তাঁহারাও তাহা ছাড়িতেছেন। এদিকে বিদ্যাসাগরমহাশয় প্রাণপণ করিয়া দুই-চারিজন উচ্চবর্ণের বিধবাদের মধ্যে বিবাহ চালাইতে পারিলেন কি না বলা সন্দেহ, অথচ নিম্নতর শ্রেণীর বিধবারা দলে দলে পত্যন্তর-গ্রহণ ছাড়িয়া পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়া রক্ষিতা হইয়া রহিল। যদি তাহারা সেইরূপ যতিধর্ম পালন করিতে পারিত তবু একটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু বিধবা-বিবাহ বাদ দিবার ফলে নানা অনাচার ভ্রূণহত্যা এবং সমাজক্ষয় হইয়াই চলিয়াছে। হয়তো ক্রমে এইভাবেই হিন্দুসমাজ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

সতীদাহ বন্ধ করিতে তো কম হাঙ্গামা হয় নাই। অবশেষে আইন করিয়া তাহা বন্ধ করিতে হয়। আকবরের সময় অনেক বিধবা পুড়িয়া মরিবার ভয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

স্ত্রীধন

সম্পত্তির অধিকার-প্রকরণে এই বিষয়ে কিছু বলা হইয়া থাকিলেও পুনরায় প্রয়োজনবশতঃ স্ত্রীধনের কথা আর-একটু বিশদভাবে বলিতে হইতেছে।

স্ত্রীধনের কথা বলিতে গিয়াও শাস্ত্রকারেরা বেশ স্পষ্টভাবেই সব বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। নারদীয়-মনুতে দেখা যায়—

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং ভর্তৃদায়স্তথৈব চ।

ভ্রাত্রা দত্তং পিতৃভ্যাং চ ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনম্ স্মৃতম্। ১৩. ৮

এই শ্লোকটি পারিভাষিক শব্দে পূর্ণ হওয়ায় ভাষ্যকার গোবিন্দস্বামীর ভাষ্যানুবাদ দেওয়া যাইতেছে—

'বিবাহকালে দত্ত, কাহারও মতে স্বামী প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞাতিকুলে পুনরায় আসিবার সময়ে দত্ত, অন্যদের মতে স্বগৃহে আনয়নকালে দত্ত, স্বামী খুশি হইয়া পরে যাহা দেন, ভাই-পিতা-মাতা যাহা দেন এই ছয়প্রকার যে স্ত্রীধনের কথা লোকে বলে এইখানে তাহাতে সম্মতি দেওয়া যাইতেছে। ইহা স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত।'

মনুসংহিতায়ও (৯. ১৯৪) এই বিধানই স্বীকৃত।

বহু স্মৃতিতে স্ত্রীধন বিষয়ে আলোচনা আছে। বাহুল্য ভয়ে সবগুলি না দেখিয়া কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীধনের ব্যবস্থা দেখা যাউক, কারণ অর্থশাস্ত্র হইল চলিত আইন।

অর্থশাস্ত্রের মতে, বৃত্তি অর্থাৎ ভরণপোষণের জন্য যে ধন, এবং 'আবন্ধ্য' অর্থাৎ অলংকারাদি হইল স্ত্রীধন—

বৃত্তিরাবন্ধ্যং বা স্ত্রীধনম্। অর্থশাস্ত্র, গণপতি শাস্ত্রী, II, ৫৯, পৃ ১৪

সাধারণতঃ বৃত্তির জন্য দত্ত ধন হাজার পর্যন্ত হয়।

দ্বিসহস্রের উপর বৃত্তি থাকিলে তাহা (জ্ঞাতিগণের কাছে) স্থাপ্য—

পরদ্বিসাহস্রা স্থাপ্যা বৃত্তিঃ। ঐ

অলংকারের বিষয়ে এইরূপ কোনো নিয়ম নাই—

আবন্ধ্যানিয়মঃ। ঐ

স্বামী যদি ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করিয়া বিদেশে যান তবে নিজের,

পুত্রের ও পুত্রবধূর ভরণ-পোষণে এই স্ত্রীধন হইতে ভার্যা ব্যয় করিলে দোষ হয় না—

তদাত্মপুত্রস্নুষাভর্মণি প্রবাসাপ্রতিবিধানে চ ভার্যায়া ভোক্তুমদোষঃ। ঐ

দস্যু প্রভৃতির আক্রমণে ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ-ভয় প্রতিকারে এবং ধর্মকার্যে পতি যদি ইহা হইতে ব্যয় করেন তবে দোষ হয় না—

প্রতিরোধকব্যাধিদুর্ভিক্ষভয়প্রতিকারে ধর্মকার্যে চ পত্যুঃ। ঐ

সন্তান হইবার পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া যদি তিন বৎসর এই স্ত্রীধন হইতে ভোগ করে, তবে ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চতুর্বিধ ধর্মিষ্ঠ বিবাহবিধিতে পরিণীত হইয়া থাকিলে পতি বা পত্নী কাহারও অপরাধ হইবে না—

সম্ভূয় বা দম্পত্যোর্মিথুনং প্রজাতয়োস্ত্রিবর্ষোভুক্তং চ ধর্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু নানুযুঞ্জীত। ঐ

যদি গান্ধর্ব ও আসুর বিবাহ হইয়া থাকে এবং এমন স্থলে সুদসহ এই স্ত্রীধন পুরাইয়া দিতে হইবে—

গান্ধর্বাসুরোপভুক্তং সবৃদ্ধিকমুভয়ং দাপ্যেত। ঐ

যদি রাক্ষস ও পৈশাচ বিধিতে বিবাহ হইয়া থাকে এবং স্ত্রীধন যদি কোনো কারণে লওয়া হয় তবে তাহাকে চুরির দায়ে দেওয়া হইবে—

রাক্ষসপৈশাচোপভুক্তং স্তেয়ং দদ্যাৎ। ঐ

ইতি বিবাহধর্মঃ। ঐ

দেখা যাইতেছে, অর্থশাস্ত্র স্ত্রীধন সম্বন্ধে রীতিমত খুঁটিনাটি ধরিয়া অধিকার ও তাহার ব্যতিক্রমে আইনের ব্যবস্থা দেখাইয়াছেন।

পতিবিয়োগের পরের কথা আলোচনা করিয়া অর্থশাস্ত্র বলিতেছেন, স্বামী মারা গেলে ধর্মকামা (অর্থাৎ যে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে চাহেন না) পত্নী তখনই তাহার স্থাপ্য (দ্বিসহস্র হইতে অধিক হইলে যে বৃত্তি জ্ঞাতিদের কাছে স্থাপ্য ছিল) এবং আভরণ ও বিবাহশুল্কের যদি কিছু অংশ প্রাপ্য থাকে তবে তাহা পাইবেন—

মৃতে ভর্তরি ধর্মকামা তদানীমেবাস্থাপ্যাভরণং শুল্কশেষং চ লভেত। ঐ

আইনত পাইয়াও যদি এই স্ত্রীধন তাহার তখনই হস্তগত না হয় তবে সুদ সমেত তাহাকে দিতে হইবে—

লব্ধা বাবিন্দমানা সবৃদ্ধিকমুভয়ং দাপ্যেত। ঐ, পৃ ১৫

আর যদি সেই নারী বৈধব্যব্রত পালন না করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া আবার ঘর করিতে চাহেন (কুটুম্বকামা), তবে বিবাহকালে শ্বশুর ও পতির দত্তধন পাইবেন—

কুটুম্বকামা তু শ্বশুরপতিদত্তং নিবেশকালে লভেত। ঐ

পুনরায় বিবাহকালের এই কথা দীর্ঘপ্রবাস-প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইবে—

নিবেশকালঃ হি দীর্ঘপ্রবাসে ব্যাখ্যাস্যামঃ। ঐ

এই দীর্ঘ প্রবাসের হেতুতে পত্যন্তর গ্রহণের কথা আমরা প্রোষিত পতির কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

শ্বশুর যাহার সহিত সেই নারীকে বিবাহিতা হইতে বলেন তাহার সহিত বিবাহ না করিয়া যদি সে অন্যত্র বিবাহ করে তবে শ্বশুরের ও পতিদত্ত ধনও তাহাকে হারাইতে হয়—

শ্বশুরপ্রাতিলোম্যেন বা নিবিষ্টা শ্বশুরপতিদত্তং জীয়েত। ঐ

তবে জ্ঞাতিহস্তে অভিসৃষ্ট হইয়া থাকিলে জ্ঞাতিরা সেই নারীর কাছে যাহা পাইয়াছেন তাহা তাহাকে তখন ফিরাইয়া দিবেন—

জ্ঞাতিহস্তাদভিমৃষ্টায়া জ্ঞাতয়ো যথাগৃহীতং দদ্যুঃ। ঐ

অর্থশাস্ত্রের স্ত্রীধন-প্রকরণেও পত্যন্তর গ্রহণ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য জানা গেল।

দায়াধিকার

নারীদের পক্ষে একটা মুশকিল এই যে, তাঁহারা পিতৃকুলে জন্মিয়া পরে অন্তর্ভুক্ত হন শ্বশুরকুলে। অনেকে মনে করেন, তাঁহাদের যদি সম্পত্তি-ভাগ দেওয়া হয় তবে উভয় দিকের অংশ পাইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য বেশি হইয়া পড়িবে। আর পিতৃকুলের সম্পত্তিরও বৃথা বহুভাগ হইবে। তাহা ছাড়া পতিগৃহ হইতে নারী পিতৃকুলের সম্পত্তির ব্যবস্থা সংরক্ষণ বা চাষবাস করিতেও পারিবেন না। একদিকে এই কথা সত্য। দুইকুলের সম্পত্তির ভাগ পাইলে তাঁহাদের ভাগ বেশি হইতে পারে। আবার দুই স্থানে তাঁহাদের দাবি হইতে পারে বলিয়া কোনো কুলেরই দাবি যদি তাঁহাদের না থাকে তবে তাহাও অন্যায় হয়। হিন্দিতে একটা কথা আছে, ধোপার যে কুকুর, সে না-ঘাটের না-ঘরের।

বৈদিক যুগে সম্পত্তির এত জটিলতা ছিল না। ভাগাভাগিরও এত কঠিনতা ছিল না।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৩. ১. ৯. ৪) দেখা যায়, মনু তাঁহার সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। নাভানেদিষ্ট তাহাতে বাদ পড়ায় মনু তাহাকে শিক্ষা দিলেন কিভাবে আঙ্গিরসদের প্রসন্ন করিয়া গোধন লাভ করা যায়। এই ভাগ-ব্যাপারে দেখা যায়, শুধু গবাদি জঙ্গম সম্পত্তিরই ভাগ হইয়াছিল। ভূমির ভাগ হয় নাই। তখন ভূমির তো টানাটানি ছিল না, তাই ভূভাগের প্রয়োজন উঠে নাই। কিন্তু পরে ভূমির টানাটানি হইলে ভূমি ভাগ করাই সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিল।

এইজন্যই বৈদিক যুগে কন্যাদের গবাদি অস্থাবর সম্পত্তি দিয়া, বসন ভূষণ অলংকারাদি দিয়া পতিগৃহে পাঠানো হইত। ভূভাগ-দেওয়ার প্রয়োজন তখনও হয় নাই। তবে পরবর্তী যুগে (শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সময়ে) কথা উঠিল, কন্যারা দায়াধিকার পাইবে না। মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৪. ৬. ৪) বলিলেন, 'পুমান্ দায়াদঃ স্ত্র্যদায়াদথ' ইত্যাদি, অর্থাৎ পুরুষ দায়াদ, স্ত্রীরা নহে। ঋগ্বেদে কন্যাকে 'সম্রাজ্ঞী হও' বলিয়া যে আশীর্বাদ করিত পরবর্তী যুগে

তাহা আর বলা চলিল না। বোধায়ন-ধর্মসূত্র (২. ২. ৪৫-৪৬) বলিলেন, নারী পিতা স্বামী বা পুত্রের অধীনে থাকিবে, স্বাধীনতা পাইবে না। তাহারা শক্তিহীনা, কাজেই দায়াধিকারী নহে ইহাই শ্রুতির মত (২. ২. ৪৭)—

নিরিন্দ্রিয়া হ্যদায়াশ্চ স্ত্রিয়ো মতা ইতি শ্রুতিঃ।

উত্তরাধিকারে আপস্তম্ব (১৪. ২-৪) বলিলেন, পুত্রাভাবে সপিণ্ড, সপিণ্ডাভাবে আচার্য, আচার্যাভাবে ছাত্র, অথবা দুহিতা পাইবেন। স্ত্রী শুধু পাইবেন অঙ্গধৃত অলংকার (২. ৯)। তাহা শুধু কাহারও কাহারও মতে স্ত্রীর প্রাপ্য, সর্বসম্মতিতে নহে। গৌতম বসিষ্ট প্রভৃতিরও এই মত।

মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৪. ৬. ৪) বলিলেন, কন্যা জন্মিলে সবাই তুচ্ছ করে, সে ফেল্না; পুত্র তো ফেল্না নহে তাই কন্যা উত্তরাধিকার পায় না, পুত্র পায়। কন্যা পরের ঘরে যায়, তাই সে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর—

তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি ন পুমাংসমথ স্ত্রিয় এবাতিরিচ্যন্তে।

বেদের প্রথম দিকে সংসারে পিতাই ছিলেন কর্তা। জ্ঞাতি-বৃদ্ধেরাই সমাজকৃত্য নির্ণয় করিতেন। অর্থাৎ পুরুষদের হাতেই সব ব্যবস্থা। তাহার পর এ দেশে ভূসম্পত্তি রক্ষার জন্যও ক্রমে লড়াই প্রভৃতি করিতে হইত। তাই কি সম্পত্তি রক্ষার্থ যুদ্ধে অসমর্থ কন্যাদের আদর ক্রমে কমিল? পুত্রই তো শক্তিশালী, কন্যা নহে। তাহা ছাড়া শূদ্রাদের বিবাহ করায় নারীও সুলভ হইয়া গেল। এই ভাবটা বেদের শেষ ভাগেই দেখা যায়। মোট কথা, ক্রমেই কন্যাদের গৌরব কমিতে কমিতে চলিল। তাহার পর সমাজব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে আবার কন্যাদেরও স্থান ক্রমে একটু ভালো হইতে লাগিল। যাস্কের 'নিরুক্ত' দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৬. ৫. ৮. ২৭) আছে—

সোমো নাতিষ্ঠত স্ত্রীভ্যো গৃহ্যমানস্তং ঘৃতং বজ্রং
কৃত্বা অঘ্নন্ তং নিরিন্দ্রিয়ং ভূতম্ অগৃহ্নন্।
তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ অপীতি
পাপাৎ পুংসঃ উপস্তিতরম্ বদন্তি।

ভালো বুঝিবার জন্য সংহিতা-বচনটি সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া লিখিত হইল। ইহার অর্থ হইল, নারীদের দ্বারা গৃহ্যমান হইতেছে ইহা সোম সহ্য করিতে পারিল না। তাই ঘৃতকে বজ্র করিয়া মারিল। যখন তাহা শক্তিহীন হইল তখন

তাহারা গ্রহণ করিল। তাই নারীগণ 'নিরিন্দ্রিয়' অর্থাৎ শক্তিহীনা, তাহারা নীচ পুরুষ হইতেও নীচু হইয়া কথা বলে, এইজন্যই তাহারা 'অদায়াদী' অর্থাৎ দায়প্রাপ্তির অযোগ্য।

এই কথাই আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র ব্যাখ্যায় হরদত্ত (২. ১৩. ১) উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং তৎসমর্থনে মনুরও (৯.১৮) শ্লোক দেখাইয়াছেন—

নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ স্ত্রিয়োনিত্যমিতি স্থিতিঃ।

বঙ্গবাসী সংস্করণে মনুর সেই শ্লোকার্দ্ধ—'নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ' (৯-১৮)।

'নিরিন্দ্রিয়' কথাটি পারিভাষিক। তাহার আসল অর্থটা কি? এখানে নিরিন্দ্রিয় অর্থে 'যাহার সোমপান অধিকার নাই' ইহাই বুঝাইবে। কাজেই শ্রুতির নিরিন্দ্রিয় বলিয়া অদায়াদী কথার অর্থ অন্যরূপ হইবে। এই বিচারটি বরদরাজ তাঁহার ব্যবহারনির্ণয়ে (পৃ ৪৫৯) উত্তম রূপে দেখাইয়াছেন। পরে ব্যবহারনির্ণয় আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বলা যাইবে।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের, ৩১ সূক্তের প্রথম ঋক্—

শাসদ্ বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাৎ।

ইহার ভাষ্যে সায়ণ বলেন, প্রসঙ্গক্রমে ঋষি কুশিক একজনকে শাস্ত্রার্থ বলিতেছেন, অপুত্র পিতার পুত্রীই পুত্রিকারূপে দায়াধিকারিণী—

অপুত্রস্য পিতুঃ পুত্রী দায়াদা পুত্রিকা সতী।

এই ঋকেরও মোট কথা এই যে, পুত্রহীন পিতার কন্যা থাকিলে সেই কন্যার গর্ভজাত নাতিই পৌত্রের স্থান অধিকার করে।

এই ঋকের মন্ত্রটির আলোচনায় যাস্কের নিরুক্তে (৩. ৪) দেখা যায়, পুত্র কন্যা দুইই প্রজনন যজ্ঞের ফল, দুইই সর্বদেহ ও হৃদয় হইতে উৎপন্ন—

প্রজনন-যজ্ঞস্য রেতসো বাঙ্গাদঙ্গাৎসংভূতস্য হৃদয়াদধিজাতস্য।

কাজেই উভয়েই দায়াদ। তাহাই এই দুইটি ঋক্‌শ্লোকেও উক্ত। আত্মাই তো পুত্র হইয়া জন্মায়। তবে কোনো কোনো আচার্য বলেন, পুরুষই দায়াদ, স্ত্রীলোক দায়াদ নহে। তাই মেয়ে জন্মাইলে লোক অবজ্ঞা করে, ছেলেকে তুচ্ছ করে না। কন্যাকে দান-বিক্রয়-ত্যাগ করা চলে, পুত্রকে দান-বিক্রয়-ত্যাগ করা চলে না। কিন্তু আর-একদল আচার্য বলেন, ছেলেকেও দান-বিক্রয়-ত্যাগ চলে, শৌনঃশেপে তাহা দেখা গিয়াছে। শুনঃশেপের উপাখ্যান ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৭. ১৩-১৮) বর্ণিত।

ন দুহিতর ইত্যেকে তস্মাৎ পুমান্ দায়াদোঽদায়াদা স্ত্রীতি বিজ্ঞায়তে তস্মাৎ
স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি ন পুমাংসমিতি চ স্ত্রীণাং দানবিক্রয়াতিসর্গা বিদ্যন্তে
ন পুংসঃ পুংসোঽপীত্যেকে শৌনঃশেপে দর্শনাৎ। নিরুক্ত ৩. ৪

যাস্কের বৃত্তিতে দুর্গাচার্য দেখাইয়াছেন যে, দুহিতাও দায়াধিকারী, এতদর্থে ঋক্‌ও দেখাইয়াছেন। তাহার নিষ্কর্ষ আনন্দাশ্রম সংস্করণ হইতে দেওয়া যাইতেছে, 'দুহিতা দায়াদ্যমর্হতীত্যর্থে ঋক্' (পৃ ২০৮)। পুত্রগণ কন্যাগণ সকলেই দায়াদ ইহা এই ঋক্‌শ্লোকদ্বয়ে বলা হইল—

পুত্রা দুহিতরশ্চোভয়েঽপি দায়াদা ইত্যৃক্‌শ্লোকাভ্যামুচ্যতে। ঐ ২০৯

লোকব্যবহারেও দেখা যায়—

লোকব্যবহারোঽপি মন্ত্রাণাং বিষয়ো ভবতি। ঐ

'অঙ্গাদঙ্গাৎ' এই মন্ত্রে স্পষ্টই দুহিতারও পুত্রত্ব দেখা যায়—

অঙ্গাদঙ্গাদিত্যনেন দুহিতুঃ পুত্রত্বং স্পষ্টীক্রিয়তে। পৃ ২১০

মনুবচনও সর্ব অপত্যেরই অধিকারত্ব সূচিত করে (ঐ ২১০)। তবে ব্রাহ্মণ-বচনে দুহিতাদের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই (ঐ ২১০)। কারণ কন্যার দান বিক্রয় ত্যাগ চলে (ঐ ২১১)। মহাভারতে কন্যাবিক্রয় নিষিদ্ধ (ঐ)। আর ছেলেরও তো দান বিক্রয় ত্যাগ করা দেখা যায় (ঐ)। শৌনঃশেপ উপাখ্যানেই তাহার প্রমাণ।

যাস্কেই দেখা গেল, স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টির আদিতেই বলিয়াছেন, ছেলেমেয়ের মধ্যে দায়াধিকারে ধর্মতঃ কোনো প্রভেদ নাই—

অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়ো ভবতি ধর্মতঃ।
মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ। নিরুক্ত ৩. ৪

যাস্ক এই বিবাদ মিটাইতে গিয়া বলিলেন, পুত্র না থাকিলে কন্যারই এইরূপ অধিকার। পুত্রিকা বলিয়া এই দাবি। 'সপিণ্ড ধনাধিকার পাইবে' এই পুরাতন কথাটা লইয়া গোল বাধিল। পিণ্ড শব্দে দেহ। সেই অর্থে জ্ঞাতিরা বিত্ত পায়। আর শ্রাদ্ধে দেয় পিণ্ড অর্থ ধরিলে কন্যাও শ্রাদ্ধে অধিকারিণী। পুত্রাভাবে শ্রাদ্ধের অধিকারী বলিয়া কন্যার গৌরব পরে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তখনকার দিনে দত্তকপুত্রের স্থান খুবই নীচে ছিল।

তাহার পর আসিল কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের যুগ। অর্থশাস্ত্র (Jolly) বলিলেন, পুত্র থাকিলে পুত্র অথবা ধর্মবিবাহে জাতা কন্যা উত্তরাধিকারী—

পুত্রবতঃ পুত্রা দুহিতরো বা ধর্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু জাতাঃ। ৩. ৫. ৬০, দায়ক্রমঃ, ৯

ধর্মবিবাহে জাত না হইলেও কন্যা অধিকারিণী হয়, তবে তখন ভাই ও সহজীবীরা পাইবে দ্রব্য এবং সেই কন্যা পাইবে রিক্‌থ (ঐ ৮)।[৫১]

আমরা প্রধানতঃ এখানে দেখিতেছি সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিতে ব্যবস্থাপকদের পক্ষে তাহা জানা প্রয়োজন হইলেও আরও নানাদিকে তাঁহাদিগকে বিচার করিতে হয়।

মনুর (৯-১১৮) সিদ্ধান্ত অনুসারে পুত্রেরা যাহা পাইবে তাহার চারিভাগের একভাগ প্রত্যেক ভাই কন্যাদের দিবে। মূলে আছে কন্যা। কুল্লুক অর্থ করিলেন, অনূঢ়া ভগিনী। অনূঢ়া ভগিনী না হইলেও যে অধিকারিণী হওয়া যায়, তাহা বুঝা যায় মনুর আর-একটি শ্লোকে— সম্পত্তি বিভাগকালে ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ যে ভাই মৃত বা সন্ন্যাসী হইবে তাহার অংশ লুপ্ত হইবে না। সহোদর ভ্রাতারা এবং সোদর্যা ভগিনীরাও ঐ অংশ হইতে সমান ভাগ পাইবে—

ভ্রাতরো যে চ সংসৃষ্টা ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ। ৯. ২১২

যাজ্ঞবল্ক্য (ব্যবহার, ৮. ১১৫) বলেন, স্বামিদত্ত বা শ্বশুরদত্ত স্ত্রীধন না থাকিলে সম্পত্তি ভাগ করিবার সময় পত্নীদেরও সমান অংশ থাকা উচিত। পুত্রদের একচতুর্থাংশ কন্যা পাইবে ইহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও মত। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

পিতুরূর্দ্ধং বিভজতাং মাতাপ্যংশং সমং হরেৎ। ব্যবহারাধ্যায়, দায়বিভাগপ্রকরণ, ৮. ১২৩

এখানে মাতারও সমানাংশ দাবির কথা স্বীকৃত। বৃহস্পতি বলেন, মায়েরা সমান অংশ, কন্যারা চারিভাগের একভাগ পাইবে—

সমাংসা মাতরস্তেষাং তুরীয়াংশশ্চ কন্যকাঃ।

বীর-মিত্রোদয় ব্যবহার-প্রকাশের প্রমেয়নিরূপণ প্রকরণে দায়ভাগে সমবিভাগে পত্নীর অংশও স্বীকৃত হইয়াছে।[৫২]

মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারদের সময়ে হয়তো পিণ্ডদিবার অধিকারিণী বলিয়া

৫১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (যোগেন্দ্র-রিসার্চ প্রাইজ প্রবন্ধ) 'হিন্দু-স্ত্রীধনাধিকার' নামে একখানা ভালো পুস্তক বাহির করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয়ে খুঁটিনাটি সব সিদ্ধান্ত জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি পড়া উচিত। তাঁহার গ্রন্থ আইনব্যবসায়ী ও স্ত্রীধন লইয়া যাহাদের কাজ করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় উপাদেয়।

৫২ দায়ভাগে সমবিভাগে পত্নীনামপ্যংশঃ, Vol. vii, পৃ ৪৪৯

ক্রমে কন্যাদের একটু গৌরব বাড়িতে লাগিল। তাই মনু (৯. ১৩০) বলিলেন, আত্মার সমান পুত্র, পুত্রের সমান কন্যা। সেই আত্মা থাকিতে কেন অন্যে ধন হরণ করিবে?

পূর্বে নিয়ম ছিল, পুত্রহীন লোক কন্যাকে বিবাহ দিবার সময় এই নিয়মে নিয়ত করিয়া বিবাহ দিত যে এই কন্যার পুত্র তাহার মাতামহের বংশরক্ষা করিবে। মনু এই ভেদ তুলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, দৌহিত্র ও পৌত্রে কোনো ভেদ নাই—

পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে। মনু, ৯, ১৩৯

কাজেই তখন হইতে নিয়ত ও অনিয়ত পুত্রিকাপুত্রভেদ আর রহিল না। মনু (৯.১৩১) বলেন, অপুত্রের সমস্ত বিষয় দৌহিত্র পাইবে।

বিবাহকালে বরকন্যা একত্র বসিয়া যে ধন আশীর্বাদরূপে পায় তাহাই যৌতক।

মনু (৯.১৯৪) যে ছয় প্রকার স্ত্রীধন বলিয়াছেন তাহা অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিকর্মে দত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত; ইহার মধ্যে তো যৌতক নাই। অথচ মনুই (৯.১৩১) বলেন, মায়ের যাহা যৌতক তাহা কুমারী কন্যারই প্রাপ্য—

মাতুস্তু যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।

এই যৌতক তবে কি? বীরমিত্র বলেন, বিবাহকালে বরকন্যা একত্র বসিলে বন্ধুদের কাছে উপহারস্বরূপে প্রাপ্ত ধন, তাহাই যৌতক।[৫৩]

জীমূতবাহনের দায়ভাগ শ্রীকৃষ্ণতর্কালংকার-কৃত টীকা সহিত ভরত-শিরোমণি মহোদয় ১৯০৭ সালে সংস্কৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। তাহাতে দেখি, পুত্রহীন মৃতের পত্নী তাহার ভাগহারিণী হইবে। সনাভি সহোদররাও। এইরূপ সহোদর ভাই থাকিতেও পত্নীর অধিকার আছে বুঝা যায়—

তেষু সৎস্বপি পত্ন্যা ধনসম্বন্ধং বোধয়তি। পৃ ১৯০

ছেলের পুত্র না থাকিলে মাতা দায় পাইবেন। ইহাতে বৃহস্পতিরও সম্মতি আছে (ঐ পৃ ২০৫-২০৬)। বিষ্ণুশ্রুতি অনুসারে, পিতার অভাবে মায়ের অধিকার (ঐ পৃ ২০৭)।

৫৩ বীরমিত্রোদয় ব্যবহার-প্রকাশের প্রমেয়নিরূপণ প্রকরণে, Vol. vii, পৃ ৫৪৮

পুত্র না থাকিলে কন্যা অধিকারী এই কথা মনু নারদ উভয়েরই সম্মত (ঐ পৃ ১৯৪)। দুহিতাদের মধ্যে প্রথমে কুমারীরই দাবি, কুমারী কন্যা না থাকিলে বিবাহিত কন্যাও পাইবে (ঐ পৃ ১৯৫)। এ বিষয়ে পরাশরই মত দিয়াছেন[৫৪]— কলিতে পরাশরমতই সকলের উপরে— 'কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ'। তবু বিজ্ঞানেশ্বর কন্যাদের অধিকার সমর্থন করিতে গিয়া পরাশরের এই বচন উল্লেখ করেন নাই, অথচ কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির বচনের উপর নির্ভর করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের শেষভাগে কন্যাদের দায়াধিকার যে যাইতে বসিয়াছিল তাহার ক্রমে একটু উন্নতি দেখা গেল যাস্কের যুগে। তিনি কন্যাদের অধিকার-বিরোধী, এবং অধিকার-সমর্থক, উভয়দলের কথা লইয়া বিচার করিয়া অপুত্রের ধনের অধিকার কন্যাতে দিয়া সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিলেন। কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়, নারীদের দায়াধিকার আর-একটু ভালো হইয়াছে। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকর্তাদের সময়েও নারীদের দায়ের অধিকার অনেকটা স্বীকৃত হইল। কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে ভারতে নারীদের সামাজিক স্থান যে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল তাহার আর উন্নতি হইল না। মনু নারীদের সম্বন্ধে 'স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু বিশেষোনাস্তি কশ্চন' (৯. ২৬) বলিলেন। মনু বলিলেন, যে গৃহে নারীরা সুখী সে গৃহে দেবতারা প্রসন্ন, ; স্ত্রীদের তিনি 'রত্ন'ও বলিলেন (২.২৩৮), স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রীতি থাকিলেই কল্যাণ (৩, ৬০)। তথাপি তিনি সামাজিকভাবে (২. ২৩৮) স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারে সমতা দিতে রাজি ছিলেন না (৫. ১৪৭-১৪৯ ; ৯. ৩ ইত্যাদি)।

তার পর আসিল নিবন্ধকারদের যুগ। অর্থাৎ বিজ্ঞানেশ্বর, রঘুনন্দন প্রভৃতি সব আচার্যগণ নানা স্মৃতি তুলনা ও বিচার করিয়া দেশ ও কালধর্ম আলোচনা করিয়া যেসব ব্যবস্থাগ্রন্থ লিখিয়া গেলেন তাহাই নিবন্ধ। মাধবের লেখা 'পরাশর' টীকাগ্রন্থ হইলেও তাহা নিবন্ধের মতই বৃহৎ এবং সেইরূপ বিচার ও আলোচনায় পূর্ণ এবং তাহা নিবন্ধেরই মত সর্বত্রমান্য। ইহা চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা।

বঙ্গদেশে দায়বিষয়ে চলে জীমূতবাহনের দায়ভাগ, আর অন্যত্র প্রায় সর্বত্রই

৫৪ অপুত্রস্য মৃতস্য কুমারী রিক্থং গৃহ্ণীয়াৎ তদভাবে চোঢ়া। ঐ, ১৯৫

দায়বিষয়ে মিতাক্ষরাই মান্য। মিতাক্ষরা রক্তের সম্বন্ধ দিয়াই দায়াধিকারের ক্রম-ব্যবস্থা করিয়াছেন। দায়ভাগে পিণ্ডাধিকার দিয়াই বিচার। অর্থাৎ মিতাক্ষরার মতে রক্তসম্বন্ধে যেই যত ঘনিষ্ঠ তাহারই তত বেশি দায়াধিকার। আর দায়ভাগে জীমূতবাহন দেখিয়াছেন, শ্রাদ্ধে এবং পিণ্ডে কাহার দাবি বেশি। 'সপিণ্ড' কথাতে দুইই সূচিত হয়। পিণ্ডের অর্থ দেহও হয়।

আসলে বৈদিক যুগের পর নারীগণের অধিকার যে ক্রমে একটু ভালো হইল তাহার কারণ এই পিণ্ড দিবার অধিকার।

যুক্তির দিকেও দেখা যায়, নারীদের যদি স্বাধীনতা না-ই দেওয়া হয়, আর অভিভাবকের মৃত্যুর পর তাহারা যদি তাহার ধনাধিকারও না পায় তবে তাহাদের ভরণপোষণের হইবে কি? স্বাধীন উপার্জন অসম্ভব, কারণ স্বাধীনতা নাই। জ্ঞাতিরা পোষণ করিবেন এইরূপ শাস্ত্রীয় বিধান থাকিলেও হয়তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল জ্ঞাতিরা পোষণ করেন না। তাহাতে পেটের জন্য নারীদের নানা নৈতিক অধোগতি স্বীকার করিতেই হয়। কখনও যাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই, সাধু স্বাধীন অর্জনের কোনো পথই যাহার পক্ষে উন্মুক্ত নাই, তাহার পক্ষে হঠাৎ বিষম দশায় পড়িলে খুবই হীনবৃত্তি স্বীকার ছাড়া গতি কি? এমন করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে পতিতাদের দলবৃদ্ধি হয়। বাল্যকালে কাশীতে দেখিয়াছি বহু বহু অভিজাতা নারী জ্ঞাতিদের ও পিতৃকুলের লোকের দ্বারা বৃত্তিবঞ্চিত হইয়া কাশীতে দাসী বা পাচিকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। কেহ কেহ ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুরবস্থায় পড়িয়া অনেকে পতিতা হইতেও বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেরই নাম ধাম ও ইতিহাস সেখানে অনেকে জানিতেন। এইসব কারণেই হয়তো নিবন্ধকার-গণের অনেকেই নারীদের দায়াধিকার অল্পবিস্তর সমর্থন করিলেন। অবশ্য সেক্ষেত্রেও পুরুষদেরই প্রাধান্য সর্বাগ্রে দেওয়া হইল।

এখন তো প্রাচীন যুগের একান্নবর্তী-পরিবার-প্রথা ভাঙিয়াই গিয়াছে। চাকুরির জন্য ভদ্রলোকেরা সবাই এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। এখন যদি চাকুরির স্থলে কেহ মারা যান তবে একমুহূর্তে পরিবার নিরাশ্রয়। একান্নবর্তী-পরিবারপ্রথা-লোপের সঙ্গেসঙ্গে এই এক মহাসমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে যে দায়ে পড়িয়া কতস্থানে কত দুর্গতি ও দুর্নীতি বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা বলা যায় না। অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা না করিলে আর গতি নাই। এখনও যদি

নারীদের দায়াধিকার সম্বন্ধে ভালো কোনো ব্যবস্থা না হয় তবে ভবিষ্যতে আরও কত দুর্গতি আছে, তাহা কে জানে?

নিবন্ধকারেরাও বোধ হয় এইসব কারণেই পরবর্তী শ্রুতিতে 'স্ত্রিয়ঃ অদায়াদীঃ' বলা সত্ত্বেও নারীদের দায়াধিকারসমর্থনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা হইতে জীমূতবাহনের দায়ভাগ ভালো। দায়ভাগে নারীদের অধিকার একটু বেশি দেওয়া হইয়াছে। কাশ্মীরের 'অপরার্ক' (দ্বাদশ শতাব্দী) তো স্পষ্টই বলিলেন, শ্রুতির অভিপ্রায় পুত্র থাকিলে কন্যারা পাইবে না। তবে পুত্র না থাকিলে কন্যারা পাইবে না কেন? স্মৃতি-চন্দ্রিকায় বলা হইল, কুমারী এবং সধবারা দায়াধিকার পাইতে পারেন। এই কথাতে বিধবাদের বাদ দেওয়া হইল। যদিও ইহাতে বিধবার প্রতি সুবিচার করা হইল না তবু দেবণ্ণভট্ট শ্রুতির অন্যায় ব্যবস্থাকে যতদূর সরাইয়া রাখা যায় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। নিবন্ধকারেরা যতটা পারেন করিয়াছেন কিন্তু এখন অবস্থাগতিকে এই বিষয়ে আরও সুবিচার ও সংস্কারের প্রয়োজন। শুধু সামাজিক স্বাধীনতা হইলেই তো হইবে না, আইনের বাধাও দূর করিতে হইবে। বোম্বাই প্রদেশে মিতাক্ষরা চলে। সে দেশে নারীদের অবরোধ নাই, কিন্তু মিতাক্ষরাতে নারীদের দায়াধিকার সংকুচিত। বাংলাদেশে নারীদের অবরোধ আছে। অথচ বাংলাদেশেই নারীদের দায়াধিকার অপেক্ষাকৃত ভালো।

ধর্মব্যবহারে বেদ ও স্মৃতি মান্য হইলেও সারা ভারতবর্ষে এখন লোকে সাধারণতঃ চলে নিবন্ধকারদের নির্দেশ অনুসারে। বিচারালয়ে সাধারণত বাংলাদেশে জীমূতবাহনের দায়ভাগ (একাদশ শতাব্দী), রঘুনন্দনের দায়তত্ত্ব বা দায়ভাগতত্ত্ব (ষোড়শ শতাব্দী) চলে। রঘুনন্দন অনেকটা জীমূতবাহনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। জীমূতবাহন আসাম এবং নেপালেও চলে। আসামের প্রামাণ্য নিবন্ধকার পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশও (ষোড়শ শতাব্দী) জীমূতবাহনের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার দায়-কৌমুদী বিবাদকৌমুদীর অন্তর্গত। তাহা ছাড়া ভবদেবভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার, শ্রীনাথ তর্কচূড়ামণি, রামভদ্র, অচ্যুতানন্দ, মহেশ্বর প্রভৃতির মতামতও বঙ্গদেশে সমাদৃত। মিথিলাতে বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত মিতাক্ষরা (একাদশ শতাব্দী) খুবই সমাদৃত। মিতাক্ষরা বঙ্গ আসাম ও পূর্বনেপাল ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। উড়িষ্যা

কাশী বিহার দক্ষিণভারত ও উত্তরভারতে ইহা অতিশয় সমাদৃত। মিথিলাতে মিতাক্ষরা ছাড়া চণ্ডেশ্বরের বিবাদরত্নাকর (চতুর্দশ শতাব্দী), বিবাদ-চন্দ্র (পঞ্চদশ শতাব্দী), বাচস্পতিমিশ্রের বিবাদ-চিন্তামণি (ঐ) ব্যবহার-চিন্তামণি (ঐ), কমলাকর ভট্টের বিবাদ-তাণ্ডব (সপ্তদশ শতাব্দী) প্রভৃতিও খুব চলে। চণ্ডেশ্বরের কিছু স্বাধীন মত ছিল, আর বাকি সকলেই মিতাক্ষরার পথবর্তী। কাশী প্রদেশে মিত্রমিশ্রের (সপ্তদশ শতাব্দী) বীর-মিত্রোদয় সমাদৃত। মিতাক্ষরা তো আছেই। নির্ণয়সিন্ধুও কাশী প্রদেশে চলে। পঞ্জাবে মিতাক্ষরা ও বীরমিত্রোদয় চলে। কাশ্মীরে চলে অপরার্ক।

মহারাষ্ট্র, উত্তরকর্ণাট, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে চলে মিতাক্ষরা, বিশ্বেশ্বর-ভট্টের মদন-পারিজাত (চতুর্দশ শতাব্দী), নীলকণ্ঠ ভট্টের ব্যবহার-ময়ূখ (সপ্তদশ শতাব্দী)। নীলকণ্ঠ দেবণ্ণভট্টের রীতি অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রচলিত দেবণ্ণভট্টের স্মৃতি-চন্দ্রিকা (দ্বাদশ শতাব্দী)। বরদরাজকৃত ব্যবহারনির্ণয়-রচনার যে কাল অধ্যাপক কানে নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। মাধবের পরাশর-টীকাও এই অঞ্চলে অতিশয় সম্মানিত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সরস্বতী-বিলাস (ষোড়শ শতাব্দী) উড়িষ্যায় রচিত হইলেও দক্ষিণভারতে বিলক্ষণ সম্মানিত।

এই সব গ্রন্থ ও আদালতের নজির দেখিয়া এখন বিচার চলে। সঙ্গে সঙ্গে মেন্ সাহেবের রচিত *Hindu Law*, কোলব্রুক রচিত *Digest*, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *Marriage and Stridhana*, মোল্লা রচিত *Hindu Law* প্রভৃতি এখন মান্য গ্রন্থ।

সেই যুগেও নিবন্ধকারদের মধ্যে যাঁহারা নারীদের এই দুর্গতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া বেদপ্রমাণ লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইটি নাম উল্লেখযোগ্য। একজন হইলেন দক্ষিণভারতের বরদরাজ; তাঁহার ব্যবহারনির্ণয় ১২৫০ খ্রীস্টাব্দের পরে হইতে পারে না। তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য সেই দেশেরই মাধবাচার্য লিখিত দায়-বিভাগ (চতুর্দশ শতাব্দী)।

শ্রুতির 'নিরিন্দ্রিয়' বলিয়া স্ত্রীলোকেরা যে দায়াধিকারী হইবে না তাহার অর্থ যে একেবারে ভিন্ন, তাহা প্রথম দেখাইলেন ব্যবহারনির্ণয়। মাধব তাঁহাকেই অনুসরণ করিলেন।

নারীদের বিবাহ প্রভৃতি সব বিষয়েই ব্যবহারনির্ণয়ের বিচার দেখা উচিত।

তাই ব্যবহারনির্ণয়ের একটু বিশদ পরিচয় পরবর্তী প্রকরণে দেওয়া যাইতেছে। তাই পরবর্তী প্রকরণে আগাগোড়া বরদরাজের বিচারপদ্ধতিই আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্যবহারনির্ণয় ১২৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লিখিত। তখন ভারতের বড় সাম্রাজ্য সব ধ্বংস হইয়াছে, মুসলমানদের আক্রমণে দেশ ব্যস্ত। বিজয়নগর সাম্রাজ্য স্থাপিত তখনও হয় নাই, তবে হিন্দুসংস্কৃতির রক্ষার জন্য এক বিরাট চেষ্টা চলিতেছিল। বরদরাজের গ্রন্থে সেই চেষ্টার পরিচয় পাই। যুক্তিযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে হিন্দুসমাজ শক্তিশালী হয় সেই প্রয়াসই ছিল বরদরাজের।

বরদরাজ-কৃত ব্যবহারনির্ণয় ও নারীদের অধিকার

একই সংস্কৃতির মানুষ নানা কারণে কালে-কালে নানা দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। তখন সকলেই নিজেদের পুরাতন ঐক্যসূত্রটি বাঁচাইয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখনও তাহারা বিচ্ছিন্ন নানা শাখার মধ্যেও আচার-ব্যবহারের ও ধর্মাচরণের সাম্য রক্ষা করিয়া নিজেদের একত্বটি বজায় রাখিতে চায়। তাহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ সঙ্কটস্থলে কর্তব্য-সংশয় উপস্থিত হইলে যদি প্রাচীন সব বিধিবিধানের সহায়তা পাওয়া যায় তবে মীমাংসার অনেক সুবিধা হয়। এইসব কারণেই বৈদিক যুগের উত্তরভাগে আমরা গৃহ্যসূত্র, কল্পসূত্র, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতির উদ্ভব দেখিতে পাই। এইসব সূত্রের দ্বারা নানা বিষয়ে প্রাচীন বিধিবিধান নানা শাখার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তখনকার দিনে নানা-প্রদেশে-বিচ্ছিন্ন ভারতের সর্বত্র আর্যসংস্কৃতির ঐক্যরক্ষার ও সংশয়মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে।

তাহার পর আরও বহুকাল চলিয়া গেল। নানা দেশে গিয়া নানা শ্রেণীর মধ্যে নানাবিধ সব নূতন আচার-ব্যবহার প্রবর্তিত হইল। তখন আরও অনেক বিষয়ে নূতন নূতন নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইল। তখনই হইল মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি নানা স্মৃতির উদ্ভব। এই স্মৃতির মধ্যে কতকগুলি সর্বত্রই অতিশয় সম্মানিত। কতকগুলি স্মৃতি অন্যত্র সম্মানিত হইলেও দেশবিশেষেই বিশেষভাবে অনুসৃত। তাই দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে ও মুখ্যগৌণভেদে স্মৃতির সংখ্যা অনেক। সেইসব স্মৃতির মধ্যে মনুর সমাদর সর্বত্র। এইসব স্মৃতিকারেরাও নানাস্থান হইতে প্রাচীন মতামত সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের গ্রন্থের নাম সংহিতা। শ্রীযুত পি. ভি. কানের গ্রন্থ দেখিলে নানাবিধ স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বোম্বাই আনন্দাশ্রম মন্বাদি প্রধান প্রধান স্মৃতি ছাড়াও অপেক্ষাকৃত দুর্লভ সাতাশটি স্মৃতি একত্রে ১৯০৫ সালে মুদ্রিত করেন।

এইসব কারণে স্মৃতি অনেক। ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে স্থানগত ও কালগত প্রয়োজন অনুসারে কখনও কখনও আচারব্যবহারের ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঝোঁক বা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

স্মৃতির পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, সংসারযাত্রার নানা সংশয়স্থলে নানা স্মৃতির তুলনা করিয়া আশ্রয় না নিলে এবং নানা প্রমাণ একত্র করিয়া বিচার না করিলে সব সময় ঠিক চলে না। এইজন্য পরবর্তী যুগে হইল সব ধর্মনিবন্ধের উদয়। বাংলাদেশের যেমন রঘুনন্দন নানাশাস্ত্র সংকলিত করিয়া যুক্তি ও বিচার করিয়া তাঁহার অষ্টবিংশতিতত্ত্বসমন্বিত নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তেমনি ভারতের নানা স্থানে নানা যুগে সব নিবন্ধকারদের উদয় হইয়াছে। বাংলা দেশে প্রধানত রঘুনন্দনেরই সমাদর। অন্যান্য বহুপ্রদেশে চলে বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত মিতাক্ষরা। তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবহারকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরাশর-সংহিতায় ব্যবহার-কাণ্ডের উপর রচিত হইল মাধবভাষ্য। মিথিলাতে চণ্ডেশ্বর ঠকুরের বিবাদ-রত্নাকর ও উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের সরস্বতী-বিলাস সমাদৃত। দক্ষিণভারতে বরদারাজ-কৃত ব্যবহারনির্ণয়, দেবণ্ণভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা এবং মাধবাচার্যের ব্যবহার-মাধবীয়ই সমধিক আদৃত।

দায়াদি বিষয়ে নারীদের অধিকারের কথা প্রাচীন নানা নিবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে। তবে ব্যবহারনির্ণয় এই বিষয়ে যেমন উদারভাবে দেখিয়াছেন তেমন সকলে দেখেন নাই। পূর্বপূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদের এই বিষয়ে কোনো সংকীর্ণতা থাকিলেও তিনি তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বলে সেই সব নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতামত অতিশয় স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। কাজেই নারীদের দায়বিচারে এই গ্রন্থখানির ভালোরূপ আলোচনা প্রয়োজন।

দক্ষিণদেশে এই গ্রন্থের প্রভূত সমাদর। সপ্তদশ শতাব্দীতে মালয়ালম্ দেশে ব্যবহার-মালা নামে ইহার একটি সংক্ষিপ্তসার রচিত হইয়াছিল। তাঞ্জোরাধিপতি মহারাজা সরফোজীর (১৭৯৮-১৮৩৩) নামে সংকলিত ব্যবহার-প্রকাশের মূলভিত্তি ও বরদারাজ-কৃত ব্যবহারনির্ণয়। পরব্রহ্মশাস্ত্রীর ব্যবহারদর্পণও এই ব্যবহারনির্ণয়েরই সংক্ষিপ্ত-রূপ। এইসবই বরদরাজ-কৃত গ্রন্থের সমাদরের প্রমাণ।

মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রে বরদরাজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার যুক্তি ও বিচারও ছিল খুব গভীর অথচ স্বাধীন। তাঁহার বুঝিবার ও বুঝাইবার রীতি অনন্যসাধারণ। 'ব্যবহার-মাতৃকা' ও ব্যবহারের বিষয়ে আইনের মূলনীতি ও আইনের বিধি সম্বন্ধে তিনি খুব বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার ব্যবহারনির্ণয় গ্রন্থখানি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থে বিদ্যা

ফলাইবার চেষ্টা একটুও দেখা যায় না। সহজ ও অসংদিগ্ধ ভাষায় সোজাসুজি মতামত ও সিদ্ধান্তগুলি দেখাইতে বরদরাজের আগ্রহ। মাধবীয় গ্রন্থে এই গুণটি দুর্লভ। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার উপর বরদরাজের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মিতাক্ষরাকে অনুসরণ করিলেও মিতাক্ষরা বরদারাজ-চরিত ব্যবহারনির্ণয়ের মত প্রাঞ্জল নহে। অনেক সময় মিতাক্ষরার বিপুল বিচারজালের মধ্যে আসল কথাটিই চাপা পড়িয়া যায়।

মনু ও বৃহস্পতির স্মৃতির উপর বরদরাজ বেশি নির্ভর করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিলেও তিনি যুক্তিকে কোথাও উপেক্ষা করেন নাই। তাই গ্রন্থারম্ভশ্লোকেই তিনি বলিয়াছেন, যুক্তি ও স্মৃতির সহায়তায় আমরা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি—

নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেঽস্মাভির্যুক্তিস্মৃত্যনুরোধতঃ।

অথচ স্মৃতিচন্দ্রিকার দেবণ্ণভট্ট বলেন, সবই আমার শাস্ত্রানুসারে লেখা, নিজের মতামত তাহাতে কিছুই ফলাই নাই (সংস্কার কাণ্ড, দ্বিতীয় শ্লোক)। যুক্তি বাদ দিয়া শুধু শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া বিচার করিতে গেলে ধর্মহানি হয় ইহাই বৃহস্পতির মত। এই মতের সঙ্গে বরদরাজের মনের মিল থাকায় তিনি বৃহস্পতির এই বাণীটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ। পৃঃ ১৩৯

সবর্ণা ও অসবর্ণা পত্নীতে জাত সন্তানদের উত্তরাধিকারের বিষয়ে অনেক শাস্ত্রকারের ব্যবস্থায় বৈষম্য আছে। বরদরাজ এইসব স্থলেও যাহাতে দায়বৈষম্য না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সুবিচারের দিকে তাঁহার সাবধান দৃষ্টি ছিল—

ন হি ভিন্নজাতীয়স্ত্রীষু জাতানাং ভ্রাতৄণাং সবর্ণাষু জাতানাম্ একজাতীয়ত্বান্ ন তত্র দায়-বৈষম্যমিতি। ব্যবহারনির্ণয়, দায়বিভাগকাণ্ড, পৃ ৪২৫

দেখা গেল, বরদরাজের সময়েও অসবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করা বন্ধ হইয়া যায় নাই। এবং তখনও অসবর্ণা স্ত্রীর সন্তানেরা সবর্ণা স্ত্রীর সন্তানেরই একজাতি হইতেন।

বিষ্ণু বলেন, সবর্ণা ভার্যার সংখ্যা অনেক হইলে জ্যেষ্ঠার সঙ্গে ধর্মকার্য করিবে। নানাজাতীয়া ভার্যা থাকিলে কনিষ্ঠা হইলেও সমানবর্ণা ভার্যার সহিত ধর্মকার্য করণীয়। সমানবর্ণা ভার্যার অভাবে 'অনন্তরা' অর্থাৎ তাহার পর নিম্ন

বর্ণের ভার্যাকে লইয়া ধর্মকার্য করিবে। তবে শূদ্রা ভার্যাকে লইয়া দ্বিজ ধর্মকার্য করিবে না—

সবর্ণাসু বহ্বীষু ভার্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়ৈব সহ ধর্মকার্যং কুর্যাৎ। মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়া অপি সমানবর্ণয়া। সমানবর্ণাভাবে ত্বনন্তরয়া। ন ত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া। ঐ, সম্ভূয়সমুত্থানাদি দশপদ কাণ্ডম্, পৃ ৩৯৭

বরদরাজ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নারদের মতে পিতার দিকে সপ্তম ও মাতার দিকে পঞ্চম ব্যবধান না হইলে সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যা বিবাহ করা চলিবে না—

আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃমাতৃতঃ।
অবিবাহ্যাঃ সগোত্রাশ্চ সমানপ্রবরাস্তথা॥ ঐ পৃ ৩৭৬

যাজ্ঞবল্ক্য হইতে এই মত তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা। ঐ

বসিষ্ঠ হইতেও উদ্ধৃত করিতেছেন,—

পঞ্চমীং মাতৃবন্ধুভ্যঃ সপ্তমীং পিতৃবন্ধুভ্যঃ। ঐ

কণ্ব বলেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাতার দিকে তৃতীয় এবং পিতার দিকে পঞ্চম হইলেই কন্যাকে বিবাহ করা যায়—

তৃতীয়াৎ ক্ষত্রিয়ো মাতুঃ পঞ্চমাৎ পিতৃতঃ পরাম্। ঐ

ব্যবহারনির্ণয় তাই বলেন, কণ্বের এই বচনবলে মাতার দিকে তৃতীয়া ও পিতার দিকে পঞ্চমী বিবাহের কথা যে পৈঠীনসি বলিয়া গিয়াছেন তাহা ক্ষত্রিয়াদির পক্ষেই প্রযোজ্য—

এতৎ কণ্ববচনবলাৎ মাতৃতস্তৃতীয়াং পিতৃতঃ পঞ্চমীমিতি পৌঠীনসিবচনং ক্ষত্রিয়াদিবিষয়ং দ্রষ্টব্যম্। ঐ

তাহার পর সুমন্তুর মত দিয়াছেন— পাঁচ ও সাত পুরুষ ব্যবধান না থাকিলে কন্যা বিবাহযোগ্যা হয় না—

কন্যা আপঞ্চমাদাসপ্তমাচ্চাবিবাহ্যা ভবন্তি। ঐ

যে কন্যাকে পণ দিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাকে পত্নী না বলিয়া দাসীই বলা উচিত। যমস্মৃতি বলেন, পণক্রীতা কন্যা দৈব ও পিত্র্যকর্মের অযোগ্য, কারণ সে দারা বলিয়া অভিহিত হইলেও দাসীমাত্র, যে হেতু পণ দিয়া তাহাকে আনা হইয়াছে—

ক্রয়ক্রীতা তু যা কন্যা ন সা পত্নী বিধিয়তে।
তথা দৈবে চ পিত্র্যে চ দাসী সা দারসংজ্ঞিতা। পৃ ৩৯৮

এই হিসাবে পণের দ্বারা সংগৃহীত বরও দাস মাত্র। যদিও তাহাকে লোকে বরই বলে, তবু আসলে সে পণক্রীত দাস বই আর কিছুই তো নহে।

মনুর বিধি উদ্ধৃত করিয়া বরদরাজও বলেন, কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ ঘরে থাকিলেও গুণহীন বরকে সম্প্রদান করিবে না—

কামমারণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রয়চ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। পৃ ৩৮৯

বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। ইহার মধ্যে যদি গুরুজনেরা বিবাহের ব্যবস্থা না করেন তবে কন্যা উপযুক্ত পতিকে নিজেই বরণ করিবে। এই বিধিও তাঁহার মনু হইতে উদ্ধৃত—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুপাসীত কুমার্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্ বিন্দেত সদৃশং পতিম্। পৃঃ ৩৮৫

এখানে এমন অনেক কথার প্রসঙ্গ-বশে পুনরুক্তি করিতে হইবে যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

দীর্ঘরোগা, কুৎসিতরোগা, আর্তা, বিকলাঙ্গা, অঙ্গহীনা, ধৃষ্টা, অন্যের কাছে যদি তাহার মন বা দেহ নিবেদিত হইয়া থাকে তবে সেই কন্যা দোষযুক্তা। এরূপ কন্যাকে বিবাহ করা অনুচিত—

দীর্ঘকুৎসিতরোগার্তা ব্যঙ্গা সংসৃষ্টমৈথুনা।
ধৃষ্টান্যগতভাবাশ্চ কন্যাদোষাঃ প্রকীর্তিতাঃ।[৫৫]

স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের পূর্বেই বরকে কন্যার বরণ করা উচিত—

স্ত্রীপুংসয়োশ্চ সম্বন্ধাৎ বরণং প্রাগ্ বিধীয়তে।[৫৬]

বরণের যোগ্য না হইলে আর বর কিসের? তাই বর যেন যুবা ধীমান এবং জনপ্রিয় হয়। তাহা হইলেও তাহার পুরুষত্ব যথাযথ আছে কি না তাহা যত্ন পূর্বক পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত,—

যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ।[৫৭]

এই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের মত উদ্ধৃত করিয়াই বরদরাজ ক্ষান্ত হন নাই। তিনি

৫৫ নারদীয়-মনু হইতে উদ্ধৃত, পৃ ৩৮২

৫৬ নারদ হইতে পৃ ৩৭৭

৫৭ যাজ্ঞবল্ক্য হইতে ধৃত. পৃ ৩৭৮

নারদের মতও উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাইয়াছেন। নারদ আরও বলেন, স্বীয় দৈহিক লক্ষণের পরীক্ষায় যদি পুরুষের পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়, সকল সন্দেহ নিরসন হইয়া যদি তাহার পুরুষত্ব নিশ্চিত হয় তবেই সে কন্যালাভ করিতে পারে—

পরীক্ষ্য পুরুষং পুংস্ত্বে নিজৈরেবাঙ্গলক্ষণৈঃ।
পুমাংশ্চেদবিকল্পেন স কন্যাং লব্ধুমর্হতি।[৫৮]

তাহার পর নারদ পুরুষলক্ষণ ও ক্লীবলক্ষণ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

ক্লীবত্ব বহুবিধ। অনেক ক্ষেত্রে তাহা দুঃসাধ্য। মানসিক বা ভাবনাগত ক্লীবত্বের প্রতীকার সম্ভব। তবে তাহার প্রতিকার একটু সময়সাধ্য। নানাবিধ ক্লীবত্বের আলোচনা বরদরাজ করিয়াছেন (পৃ ৩৭৯-৩৮১)। এই বিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা মূলগ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে পারেন।

ক্লীবত্ব নানাবিধ। কোনো ক্লীবত্ব স্থানবিশেষে, কোনোটা বা কালবিশেষে, কোনোটা বা পাত্রবিশেষে ধরা পড়ে। বিবাহের পরে স্ত্রীসঙ্গম হইবার পরেও যদি ক্লীবত্ব ধরা পড়ে, অর্থাৎ পতির পুরুষত্ব ঠিকমত নাই ইহা বুঝা যায়, তবে ভার্যা সঙ্গতা হইলেও পতিত পতির মত ভর্তাকে ত্যাগ করা চলে। নারদের এই মত ব্যবহারনির্ণয় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

সংত্যক্তব্যাঃ পতিতবৎ ক্ষতযোন্যা অপি স্ত্রিয়া। পৃ ৩৮১

ক্ষতযোনিরই যদি পুনরায় বিবাহ দিবার ব্যবস্থা নারদ দিয়া থাকেন তবে যে কন্যার মাত্র বরণ ও পাণিগ্রহণ হইয়াছে তাহার বিষয়ে আর কথা কি। তাই বরদরাজ বলেন—

কিমুতাক্ষতযোন্যা বরণপাণিগ্রহণমাত্রায়াঃ। পৃ ৩৮১

ইহার পাদটীকাতে (নারদীয় মনুসংহিতা, ১২৮ পৃষ্ঠা) দেখা যায়—

ক্ষতযোন্যা অপি, কিমুতাক্ষতযোন্যা বরণপাণিগ্রহণমাত্রেণ। পৃ ৩৮১

কোনো কোনো ক্লীবত্বে একপক্ষ বা একমাস পরীক্ষা করিলেই চলে, কোথাও কোথাও সংবৎসর দেখিতে হয়। নারদ বলেন, ইহাতেও প্রতিকার না হইলে তাহাকে ত্যাগই করিতে হইবে—

তত্রাদ্যাবপ্রতীকারৌ পক্ষাখ্যো মাসমাচরেৎ।
অনুক্রমাৎ ত্রয়স্যাস্য কালঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ। পৃ ৩৮০

৫৮ নারদীয়-মনু, ১২,৮ পৃ ৩৭৮

নারদ আরও বলেন, যদি পতির বীর্য শক্তিহীন হয় এবং তাহার প্রতিকার হইবার উপায় না থাকে তবে এক বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া নারী অন্য পতিকে বিবাহ করিবে—

আক্ষিপ্তে মোঘবীজে চ পত্যাবপ্রতিকর্মণি।
পতিরন্যঃ স্মৃতো নার্যা বৎসরং সংপ্রতীক্ষ্য তু। পৃ ৩৮১

আর-একটি বিধানও এখানে ব্যবহারনির্ণয় উদ্ধৃত করিয়াছেন (নারদীয় মনুসংহিতা, পৃ ১২৮)। পরস্ত্রীর নিকট পুরুষ হইলেও নিজের পত্নীতে যদি কেহ পুরুষত্বহীন হয় তবে তাহার স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করিতে পারে। কারণ প্রজাপতির এই বিধান—

অন্যস্যাং যো মনুষ্যঃ স্যাদমনুষ্যঃ স্বযোষিতি।
লভেত সাঽন্যং ভর্তারমেতৎ কার্যং প্রজাপতেঃ। পৃ ৩৮১

নারদীয় মনুসংহিতায় আরও দেখা যায় (১২, ১৯; পৃ ১২৮), নারী হইল ক্ষেত্র, পুরুষ হইল বীজবান্ বা বীজী। বীজ যাহার আছে ক্ষেত্র সেই পাইতে পারে। অবীজী ক্ষেত্র পাইবে কেন? তাই যদি পতি বীজহীন হয়, তবে পিতা স্বয়ং আবার সেই কন্যাকে অন্য বরের কাছে সম্প্রদান করিবেন, পিতার অনুমতিতে মাতাও দান করিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে মাতামহ, মাতুল, সকুল্য বা বান্ধব যে-কেহ কন্যাকে এইরূপ ক্ষেত্রে দান করিতে পারেন। ইহারা কেহ না থাকিলে মাতাই দিবেন। মাতা যদি অপ্রকৃতিস্থা হন তবে যে-কোনো স্বজাতি এই সম্প্রদান করিতে পারেন—

অপত্যার্থে স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ স্ত্রী ক্ষেত্রং বীজবান্ পুমান্।
ক্ষেত্রং বীজবতে দেয়ং নাবীজী ক্ষেত্রমর্হতি।
পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং মাতা বানুমতে পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যা বান্ধবাস্তথা।
মাতাভাবে তু সর্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং দদ্যুঃ কন্যাং সজাতয়ঃ। পৃ ৩৮২

কাত্যায়ন বলেন, ঘটনাক্রমে বর যদি অন্যজাতীয়, পতিত বা ক্লীব হয়, বর যদি পাপাসক্ত, সগোত্র, চিররোগী, দুঃসাধ্যরোগী হয়, ভর্তা যদি পৌরুষলক্ষণহীন ক্লীব হয়, তবে বিবাহিত হইলেও কন্যাকে সর্বাভরণভূষণা করিয়া যোগ্য অন্য বরের কাছে সম্প্রদান করিতে হইবে। এখানে 'ঊঢ়া' পদ ব্যবহারের দ্বারা কাত্যায়ন বুঝাইয়াছেন যে, কন্যার যদি বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে তবুও

সেই বিবাহ অসিদ্ধ হইবে এবং বিবাহিতা হইলেও সর্বাভরণভূষণা করিয়া কন্যাকে যোগ্য বরের কাছে পুনরায় যথাবিধি সম্প্রদান করিতে হইবে—

স চ যদ্ অন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্মস্থঃ সগোত্রো বা দীর্ঘতীব্রাময়োঽপি বা॥
ক্লীবোঽন্যো যদি বা ভর্তা বিসৃষ্টঃ পুংস্ত্বকারণৈঃ।
ঊঢ়াঽপি দেয়া সাঽন্যস্মৈ সর্বাভরণভূষণা॥ পৃ ৩৮৭-৩৮৮

যদি কন্যার শুল্ক ও স্ত্রীধন দিয়া কোনো বর দেশান্তরে চলিয়া যায়, তবে এক বৎসর তাহার জন্য প্রতীক্ষা করা যায়। তাহার পর যথাবিধানে সেই কন্যাকে অন্য বরের কাছে দান করা উচিত। যদি বরের সংবাদাদি আসে তবে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা চলে। তাহার পর অন্যের কাছে ইচ্ছানুসারে কন্যাকে বিবাহ দিতে হইবে। কাত্যায়নের এই মত ব্যবহারনির্ণয় সমর্থন করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছে—

প্রদায় শুল্কং গচ্ছেদ্ যঃ কন্যায়াঃ স্ত্রীধনং তথা।
ধার্য্যা সা বর্ষমেকং তু দেয়াঽন্যস্মৈ বিধানতঃ॥
অথ প্রবৃত্তিরাগচ্ছেৎ প্রতীক্ষেত সমাত্রয়ম্।
অথ ঊর্দ্ধং প্রদাতব্যা কন্যাঽন্যস্মৈ যথেচ্ছয়া॥ পৃ ৩৮৮

নারদ বলেন, কন্যা এইরূপ স্থলে তিন ঋতু প্রতীক্ষা করিয়াই অন্যবরকে বরণ করিতে পারে। নারদের এই বাণীও উদ্ধৃত হইয়াছে—

প্রতিগৃহ্য তু যা কন্যাং বরো দেশান্তরং ব্রজেৎ।
ত্রীনৃতূন্ সমতিক্রম্য কন্যাঽন্যং বরয়েদ্বরম্॥ পৃ ৩৮৫

যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন যদি কোনো বর বিবাহ করিয়াই দেশান্তরে চলিয়া যায়, তবে সেই প্রণষ্ট পুরুষের জন্য কন্যা তিনটি ঋতুকাল অপেক্ষা করিয়া অন্যবরকে বরণ করিবে—

বরয়িত্বা বরঃ কশ্চিৎ প্রণশ্যেৎ পুরুষো যদা।
ঋত্বাগমাংস্ত্রীনতীত্য কন্যাঽন্যং বরয়েদ্বরম্॥ পৃ ৩৮৬

আপন দোষ লুকাইয়া যদি কেহ কন্যালাভ করে তবে বরেরই দত্তধন নষ্ট নয়। সেই কন্যাকে আবার পিতার কাছে ফিরাইয়া আনা চলে। কাত্যায়নের মতে এমন স্থলে কন্যাকে আবার কুমারীর মতই বিবাহ দেওয়া সংগত হয়—

গৃহস্থিতাংস্তনো দোষান্ বিন্দতে কন্যকাং যদি।
বরস্তু দত্তনাশঃ স্যাৎ কন্যা চাপি নিবর্ত্ততে। পৃ ৩৮৮

কন্যার জন্য শুল্ক পাইবার পরে যদি আরও ভালো বর আসে, তবে নারদের মতে, পরে-আগত ভালো বরের কাছেই কন্যাকে বিবাহ দেওয়া উচিত—

কন্যায়াং প্রাপ্তশুল্কায়াং শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ
ধর্মার্থকামসংযুক্তং বাচ্যং তত্রানৃতং ভবেৎ।
পূর্বদত্তামপি শ্রেয়সে দাতুং হরেদিতি। পৃ ৩৮৬

বরদরাজও বলেন, পূর্বদত্তা হইলেও আরও ভালো বর পাইলে তাহাকেই কন্যা দিবে। যাজ্ঞবল্ক্যও এইমত সমর্থন করেন—

দত্তামপি হরেৎ পূর্বাং শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ। ঐ

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন সেইরূপ কারণছাড়া বাগ্‌দত্তা কন্যাকে ফিরাইয়া নিলে পিতা বা গুরুজন দণ্ডনীয় হইবেন। বরদরাজও বলেন, বিলক্ষণপুরুষাভাবে কন্যা ফিরাইয়া নিলে দণ্ড্য হইবে—

বিলক্ষণপুরুষাভাবে হরন্ দণ্ড্যঃ। ঐ

বাগ্‌দানের পর বা উদকপূর্বদানের পর যদি বর মারা যায়, কন্যা যদি মন্ত্রোপনীতা না হইয়া থাকে তবে তো পুনরায় বিবাহের সম্বন্ধে কোনো সংশয় বা প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ তখনও সে কুমারী এবং পিতারই সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। বসিষ্ঠের এই মত ব্যবহারনির্ণয় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াঃ ম্রিয়েতোর্দ্ধং বরো যদি।
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা। ঐ

বসিষ্ঠ আরও বলেন, বলপূর্বক কেহ যদি কন্যাকে হরণ করে এবং কন্যা যদি মন্ত্র-সংস্কৃতা না হয় তবে যোগ্য অন্য বরের কাছে তাহাকে বিধি-অনুসারে দিবে, কারণ অন্য অন্য কন্যাও যেমন সেও তেমনি—

বলাচ্চেৎ প্রহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা। পৃ ৩৮৭

বসিষ্ঠের আর-একটি বিধানও ব্যবহারনির্ণয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, কন্যার জন্য শুল্ক পাইবার পর যদি শুল্কদাতা বর মরিয়া যায় তবে কন্যার সম্মতি থাকিলে দেবরের নিকট তাহাকে সম্প্রদান করিবে—

কন্যায়াং প্রাপ্তশুল্কায়াং ম্রিয়েত যদি শুল্কদঃ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যাঽনুমন্যতে। ঐ

অথচ আমাদের বাংলাদেশে শুধু বাগ্‌দানের পর বরের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া আজীবন বহু কন্যা বৈধব্য বরণ করিয়াছেন এমন অনেক ঘটনা ছেলেবেলায় কাশীতে আমি দেখিয়াছি। তাঁহাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানই হয় নাই, অথচ সামাজিক রীতি অনুসারে আজীবন তাঁহারা বৈধব্য পালন করিয়াছেন। এই বিষয়ে মনুর একটি বিধি ব্যবহারনির্ণয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। মনু তো অতিশয় সাবধান ও কঠিন বিধি বিধানের পক্ষপাতী। তিনিও বলেন, পাণিগ্রহণ-অনুষ্ঠানমন্ত্রের সপ্তপদীর সপ্তমপদ নিক্ষেপের পর বিবাহের মন্ত্রগুলির দ্বারা কন্যার পত্নীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই বিদ্বজ্জনের মত—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্‌ভিঃ সপ্তমে পদে। পৃঃ, ৩৮৬

উদ্ধৃত যম বচনেও এই মতেরই সমর্থন মেলে। উদকপূর্ব দানে বা বাগ্‌দানে কন্যার পতিত্ব লাভ করা যায় না। পাণিগ্রহণ সংস্কারের সপ্তপদীর সপ্তম পদে পতিত্ব সিদ্ধ হয়—

নোদকেন ন বাচা চ কন্যায়াঃ পতিরিষ্যতে।
পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে। পৃ ৩৮৭

এই বিষয়ে কাত্যায়নে ও মনুতে (৯.৯৭) ইহার চেয়েও একটু উদার বিধি আছে, তাহাও ব্যবহারনির্ণয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই কন্যার সঙ্গে যদি পতির দৈহিক সম্বন্ধ না হইয়া থাকে, কন্যা যদি পতির গৃহে গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া থাকে তবে পৌনর্ভব ভর্তার সঙ্গে পুনরায় তাহার বিবাহসংস্কার হইতে পারে—

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্ গতপ্রত্যাগতাঽপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি। ঐ

শাতাতপেরও এই মতটি উদ্ধৃত হইয়াছে, কন্যা উদ্বাহিত হইলেও যদি মৈথুন না ঘটিয়া থাকে তবে পুনরায় সে পত্যন্তরে বিবাহিত হইতে পারে। কারণ অন্যান্য কুমারীকন্যার সঙ্গে তাহার তো কোনো ভেদই নাই—

উদ্বাহিতা তু যা কন্যা সংপ্রাপ্তা ন চ মৈথুনম্।
ভর্তারং পুনরভ্যেতি যথা কন্যা তথৈব সা। ঐ

স্বামী যদি বিদেশে চলিয়া যায় বা নিরুদ্দেশ হইয়া যায় তবে নারীর পক্ষে

আজীবন তাহার জন্য প্রতীক্ষা করার মধ্যে কোনো যুক্তি নাই। প্রোষিতের প্রতীক্ষাকাল হারীত নির্দেশ করিয়াছেন।[৫৯]

ধর্মহেতু প্রোষিত হইলে আটবৎসর প্রতীক্ষা করা উচিত। বিদ্যা বা যশোলাভের জন্য গিয়া থাকিলে ছয় বৎসর, এবং কামার্থ হইলে তিন বৎসর—

প্রোষিতো ধর্মহেতোস্তু প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্ যশোঽর্থং বা কামার্থং স্ত্রীংস্তু বৎসরান্। পৃ ৩৯৪

কাত্যায়ন বলেন, স্বামী প্রোষিত হইলে পিতা ছয় বৎসর পত্যন্তরের সহিত যুক্ত করিবেন না।

পিত্রা ভর্ত্রা। ন যোজ্যা স্ত্রী ষড়্বর্ষং প্রোষিতে প্রভৌ। ঐ

গৌতমও বলেন, স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে ছয়বৎসর প্রতীক্ষা, খবর পাওয়া গেলে সেখানে যাওয়া, প্রব্রজিত হইলে প্রসঙ্গবশেই নিবৃত্তি অর্থাৎ পূর্ব বিবাহ নিবৃত্ত হইবে। ব্রাহ্মণ বিদ্যা-হেতু বিদেশে গেলে দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে—

নষ্টে ভর্তরি ষড়্বার্ষিকং ক্ষপণম্। শ্রূয়মাণে অভিগমনম্। প্রব্রজিতে তু নিবৃত্তিঃ প্রসঙ্গাৎ। দ্বাদশবর্ষাণি ব্রাহ্মণস্য বিদ্যাসম্বন্ধে। পৃ ৩৯৪

যমস্মৃতি বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে লইয়া ঘর না করে তবে ব্রাহ্মণ-স্ত্রী দশ বারো বা আটবৎসর প্রতীক্ষা করিবে, ইহাই মনুর মত। ক্ষত্রিয়া আট বৎসর, বৈশ্য ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। শূদ্রের পক্ষে কোনো কাল-বাধা নাই। প্রতীক্ষা না করিলে তাহাদের ধর্মব্যতিক্রিয়া হয় না—

ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কালো ন চ ধর্মব্যতিক্রিয়া। পৃ ৩৯৫

নারদ বলেন, বিশেষতঃ অপ্রসূতার পক্ষে সংবৎসরপরা স্থিতি অর্থাৎ এক বৎসরই প্রতীক্ষা কাল।

বিশেষতোঽপ্রসূতায়াঃ সংবৎসরপরা স্থিতিঃ। পৃ ৩৯৫

স্বামীও কোনো কোনো স্থলে ভার্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা ইহার পরে বরদরাজ দিয়াছেন।

নানাভাবে সংগ্রহ করিয়া নারীদের নষ্ট করা যে কত বড় অপরাধ তাহা দেখাইবার জন্য ব্যবহারনির্ণয় 'স্ত্রীসংগ্রহ' নামে একটি আগাগোড়া প্রকরণ

৫৯ প্রোষিতস্য উক্তঃ প্রতীক্ষাকালঃ. পৃ ৩৯৪

দিয়াছেন। তাহাতে সুন্দর বিচার ও বিধান দেওয়া আছে (পৃ ৩৯৮–৪০৫)। যিনি জানিতে উৎসুক তিনি প্রমাণাদিসহ মূলগ্রন্থে তাহা দেখিতে পারেন। দাসী ক্রীতদাসী বা বেশ্যারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাতে গমন করিলে পুরুষ দণ্ডনীয় (ব্যবহারনির্ণয়, পৃ ৪০৩)। অন্যায়ভাবে নারীসংগ্রহকারীদের প্রতি দণ্ডবিধিও ভাল করিয়া আলোচিত হইয়াছে। তবে কুমারী কন্যা যদি কাহাকেও মনে মনে প্রার্থনা করে তবে সেই কন্যাকে হরণ করিলে চুরি হয় না, ইহা যমস্মৃতির বিধান। কিন্তু সেই কন্যা যেন অলংকৃতা না হয়—

কন্যাহরণমস্তেয়ং যাঽবরা যাঽনলংকৃতা। পৃ ৫১৫

এখানে বরদরাজ বলেন, সেই কন্যাকে যদি অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যে অলংকৃতা করা হয় তবে তাহাকে হরণ করিবে না—

অন্যস্মৈ দাতুমলংকৃতাং নাহরেৎ। ঐ

মনু বলেন (৯. ৯২), কন্যা স্বয়ম্বরা হইলে পিতার মাতার বা ভ্রাতার প্রদত্ত অলংকার ধারণ করিবে না। এমন ভাবে অলংকার লইলে তাহা চুরি হইবে—

অলংকারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেয়ং স্যাদ্ যদি তং হরেৎ। পৃ ৩৮৫

মনুর মতেও প্রাপ্ত-ঋতু ইচ্ছুক কন্যাকে হরণ করিলে পিতাকে কিছু শুল্ক দিবার প্রয়োজন নাই—

পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কং তু কন্যামৃতুমতীং হরন্। ঐ

নারদ বলেন, বিনা অপরাধে ভার্যাকে ত্যাগ করিলে রাজা তাহাকে কঠিন দণ্ড দিবেন—

অনুকূলামবাগ্‌দুষ্টাং দক্ষাং সাধ্বীং প্রজাবতীম্।
ত্যজন্ ভার্যামবস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভূয়সা। পৃ ৩৯৭

এমন অবস্থায় কে তাহাকে আশ্রয় দিবে, কে তাহার ভরণপোষণ করিবে?

নারদ বলেন, অপুত্রা নারী বিধবা হইলে পতিকুলের লোকেরা তাহার আশ্রয়, তদভাবে পিতৃকুলে তাহার আশ্রয়, তাহাও না থাকিলে তাহার ভরণ এবং চালনার ভার রাজার উপর (পৃ ৩৯১)। যাজ্ঞবল্ক্যমতে, বিশেষ হেতু না থাকিলে পতিপুত্রের ঋণে নারী দায়ী থাকিবে না, পুত্রের ঋণেও পিতা দায়ী হইবে না (পৃ ২৬০)। ব্যবহারনির্ণয় এই সব মত ভাল মনে করিয়াছেন তাই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নারীদের উত্তরাধিকার বিষয়ে ব্যবহারনির্ণয়

বাংলাদেশে উত্তরাধিকারের বিষয়ে জীমূতবাহনের দায়ভাগই প্রধান। জীমূতবাহন ছিলেন বাঙালি এবং একাদশ শতাব্দীর লোক। দায়ভাগ তাঁহার বৃহত্তর গ্রন্থ 'ধর্মরত্নের' অংশবিশেষ। বাংলাদেশের নিয়মের সঙ্গে মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশী, মিথিলার ঠিক মিল নাই। সেসব দেশে মিতাক্ষরারই সমাদর। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির উপর বিজ্ঞানেশ্বর যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই মিতাক্ষরা, তাহাও একাদশ শতাব্দীর।

অনেকে মনে করেন, দায়ভাগ অপেক্ষা মিতাক্ষরাতে নারীদের দায়াধিকার বেশি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ঠিক নহে। বিবাহাদির জন্য অনূঢ়া কন্যা পিতৃধনের অংশ পাইতে পারেন ইহাই মিতাক্ষরার মত, তাহাদের ঠিক দায়াধিকার নাই। মিতাক্ষরার মতে, নারীদের দ্বারা ধর্মত উপার্জিত ধনেও স্বামীরই অধিকার। তাহাও স্ত্রীধন নহে। স্ত্রীধন একটি পারিভাষিক শব্দ। অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, অন্বাধেয়, যৌতক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধনই স্ত্রীধন। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে পাওয়া ধনও স্ত্রীধন হইতে পারে, ইহা কোথাও কোথাও দেখা যায়। স্ত্রীধন ছাড়া আরও কোনো কোনো ধনে বা খোরপোশ পাইতে নারীর আধিকার আছে, কিন্তু তাহাতে নারীর দান-বিক্রয়াদির পূর্ণাধিকার নাই। স্ত্রীধনে নারীরই অধিকার। স্বামী তাহা হইতে কিছু লইতে বাধ্য হইলেও তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য। তবে আপৎকালে বা স্বামী অসমর্থ হইলে স্বতন্ত্র কথা।

দায়ভাগ বা মিতাক্ষরার মতামত অনেকেই জানেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে দেশপ্রচলিত স্মৃতি-নিবন্ধাদি আলোচনা করিয়া সেই বিষয়ে শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের 'হিন্দু স্ত্রীধনাধিকার' গ্রন্থখানি অতিশয় যত্নের সহিত লিখিত। তাহার বিশেষ আলোচনা না করিয়া বরদরাজ-কৃত ব্যবহার-নির্ণয়ের মতামত এই বিষয়ে কি তাহাই এখানে দেখানো যাইতেছে।

ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারি জাতীয়া পত্নী ও তাহাদের

গর্ভজাত সন্তান থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে ধনবিভাগ কি ভাবে হইবে তাহা বরদরাজ মনু হইতে (৯. ১৫২) উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ ৪২৮) এবং বৃহস্পতির ব্যবস্থাও দেখাইয়াছেন (ঐ)। বিষ্ণু বলেন, সর্বত্রই আনুলোম্যে জাত পিতার এক পুত্র পিতার সমগ্র ধন পাইবে—

সর্বত্রানুলোম্যেন জাতঃ পিতুরেকঃ পুত্রঃ পিত্র্যং সর্বং ধনমর্হতি। পৃ ৪২৯

দেবলও এই কথাই বলেন—

আনুলোম্যৈকপুত্রস্তু পিতুঃ সর্বস্বভাগ্ ভবেৎ।

শূদ্রাতে জাত আনুলোম্য পুত্রের পক্ষে এই বিধি চলিবে না (ঐ)—

শূদ্রায়াং জাতপুত্রব্যতিরিক্তবিষয়মিদম্। (ঐ)

বৃহস্পতি বলেন, দ্বিজাতির যদি মাত্র শূদ্রকন্যাতে এক পুত্র হয় তবে সেই পুত্র অর্ধভাগ পাইবে—

দ্বিজাতেঃ শূদ্রায়াং জাতস্ত্বেকঃ পুত্রোঽর্দ্ধভাগিতি বৃহস্পতিঃ। ঐ

বিষ্ণুও বলেন—

দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্বেকঃ পুত্রোঽর্ধহরঃ। ঐ

দেবল বলেন, ব্রাহ্মণের যদি শূদ্রপত্নীর গর্ভজাত সন্তান থাকে তবে পিতার মরণে সে এক-তৃতীয়াংশ ও শ্রাদ্ধাধিকারী সপিণ্ড সকুল্যেরা দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে—

নিষাদ একপুত্রস্তু বিপ্রস্য ত্র্যংশভাগ্ ভবেৎ।
দ্বৌ সপিণ্ডঃ সকুল্যো বা স্বধাদাতা তু সংহরেৎ। পৃ ৪৩০

শূদ্রের যদি দাসীগর্ভজাত পুত্র থাকে তবে সেও পিতার ধনের অংশ পাইবে—

দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যচ্ছূদ্রস্য সুতো ভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ। পৃ ৪৩১

যাজ্ঞবল্ক্যও তাহা সমর্থন করেন—

জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরো ভবেৎ। ঐ

এইখানে বলা উচিত যে 'অংশ' ও 'দায়' এক কথা নয়। দায়ে নির্দিষ্ট ভাগ অভিপ্রেত, অংশ শব্দে অনির্দিষ্ট কিয়ৎপরিমাণ অর্থ বুঝায়। তাহা ভরণপোষণ বা খোরপোশ এই দুইয়েরই বহির্ভূত। যাহার দায়ে বা অংশে কোনো দাবি নাই সেও খোরপোশ পাইতে পারে। যথা, প্রতিলোমজাতপুত্রদেরও ভরণপোষণ দিতে পিতা বাধ্য এই কথা গৌতম বলেন—

প্রতিলোমানামপি সংব্যবহার্যাণাং সুতানাং শুশ্রূষণাং জনকেন জীবনং দেয়মিত্যাহ গৌতমঃ। পৃ ৪৩০

নারীদের দায়াধিকারের কথাপ্রসঙ্গে দেখা যায় বরদরাজ খুবই উদার ও যুক্তিযুক্তভাবে তাহার সমাধান করিয়াছেন। বিষ্ণুস্মৃতির মতে তিনি বলেন, মায়েরা পুত্রেরই ভাগানুসারে ভাগহারিণী হইবেন—

মাতরঃ পুত্রভাগানুসারিভাগহারিণ্য ইতি। পৃ ৪২৯

বরদরাজ বলেন, কেহ কেহ পত্নীদের ভাগ স্বীকার করেন না—

তত্র পত্নী নির্ভাগেতি কেচিৎ। পৃ ৪১৪

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, স্বামী বা শ্বশুর যদি নারীকে স্ত্রীধন না দিয়া থাকেন তবে পুত্রদের সমান অংশ পত্নীকে দেওয়া উচিত—

যদি কুর্যাৎ সমানংশান্ পত্ন্যঃ কার্যাঃ সমাংশিকাঃ।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা। পৃ ৪১৫

যদি পিতা সব পুত্রদের ভাগ সমান করিয়া দেন তবে সজাতীয় পত্নীদেরও সমান ভাগ দেওয়া উচিত। যদি স্বামী বা শ্বশুরের দেওয়া কিছু স্ত্রীধন নারীরা পাইয়া থাকেন তবে যতটা দিলে পুত্রদের সঙ্গে তাহাদের ভাগ সমান হয় ততটা দেওয়া কর্তব্য—

যদা স্বেচ্ছয়া পিতা সর্বানেব সুতান্ সমভাগিনঃ করোতি, তদা সজাতীয়পত্ন্যশ্চ পুত্রসমাংশভাজঃ কর্তব্যাঃ। যাসাং পত্নীনাং ভর্ত্রা শ্বশুরেণ বা স্ত্রীধনং দত্তং, দত্তে চ স্ত্রীধনে তদপেক্ষয়া ভাগপরিপূরণং কর্তব্যম্। পৃ ৪১৫

মিতাক্ষরাতেও ঠিক এই বিধানই দেখা যায় (২. ১১৫)। কাজেই মিতাক্ষরাও এই মতই সমর্থন করেন (ঐ)।

পিতার জীবৎকালে বিভাগ হইলে মাতাদের ভাগ সমান হইবে। এই কথা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পিতামৃতেও মাতারা সমাংশভাগিনী হইবেন।

এবং জীবদ্বিভাগে সমাংশভাগিত্বং মাতৄণামুক্ত্বা পিতরি মৃতেঽপি সমাংশভাজো ভবন্তীত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ব্যবহারনির্ণয়, পৃ ৪১৫

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলেন, পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগকালে মাতাও সমান অংশ পাইবেন—

পিতুরূর্ধ্বং বিভজতাং মাতাঽপ্যংশং সমং হরেৎ। ঐ

নারদও বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর মাতা সমাংশভাগিনী—

সমাংশভাগিনী মাতা পুত্রাণাং স্যান্মৃতে পত্যৌ। ঐ

বৃহস্পতির মতেও—

তদভাবে তু জননী তনয়াংশসমাংশিনী। পৃ ৪১৬

ব্যাসও এই কথা সমর্থন করেন এবং পিতামহীকেও মাতার মত ভাগাধিকার দেন—

অসুতাস্তু[৬০] পিতুঃ পত্ন্যঃ সমানাংশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
পিতামহ্যশ্চ সর্বাস্তু মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

কাজেই মায়েদের মত পিতামহীদেরও ভাগাধিকার থাকা উচিত—

পিতামহ্যা অপি মাতৃবদ্ভাগকল্পনং যুক্তমিতি।

বিষ্ণু বলেন, মাতা এবং অবিবাহিতা কন্যা পুত্রভাগানুসারিভাগহারী—

মাতরঃ পুত্রভাগানুসারিভাগহারিণ্য অনূঢ়াশ্চ দুহিতরঃ ইতি। ঐ

বৃহস্পতি বলেন, মায়ের ভাগ সমান, কন্যার ভাগ একচতুর্থাংশ—

সমাংশা মাতরস্তেষাং তুরীয়াংশা চ কন্যকা। ঐ

কাত্যায়নও অবিবাহিতা কন্যার এক চতুর্থাধিকারই সমর্থন করেন—

কন্যকানাং ত্বদত্তানাং চতুর্থো ভাগ ইষ্যতে।
ভ্রাতৄণাং চ ত্রয়ো ভাগাঃ সমং স্বল্পধনে স্মৃতম্।

সামান্য সম্পত্তি হইলে কন্যা ও পুত্রদের ভাগ সমানই হইবে।

মনু বলেন, ভাইরা আপন ভাগ হইতে কন্যাকে ভাগ দিবেন। না দিতে চাহিলে ভ্রাতারা পতিত হইবেন—

স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
স্বাৎস্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ। ঐ

শঙ্খ-লিখিত এবং বোধায়ন বলেন, দায়ভাগকালে কন্যা আপন ভাগের সহিত নিজ অলংকার ও বৈবাহিক স্ত্রীধনও পাইবেন—

বিভজ্যমানে দায়াদ্যে কন্যালংকারং বৈবাহিকং স্ত্রীধনং চ কন্যা লভেত। পৃ ৪১৭

পৈঠীনসি বলেন, কন্যা এই সঙ্গে বৈবাহিক স্ত্রীধনও পাইবেন—

কন্যা বৈবাহিকং স্ত্রীধনং চ লভেত। ঐ

পুত্রাভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কিরূপ হইবে সেই বিষয়ে বরদরাজ বহু প্রাচীন বিধি সংকলিত করিয়া বিচার করিয়াছেন (পৃ ৪৪৮-৪৬১)। স্ত্রীগণের দায়াধিকার বিষয়ে যে অনেকের ভালো সম্মতি নাই তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।

৬০ 'সসুতা' পাঠও আছে।

এবং সেইসব প্রতিকূল মত খণ্ডন করিয়া যুক্তিযুক্ত উত্তম মতটি স্থাপন করিয়াছেন। বরদরাজ বলেন, অনেকে মনে করেন পুত্রাভাবেই কন্যারা পিতার সম্পত্তি পাইতে পারেন—

যানি পুনর্দুহিতৄণাং ধনপ্রতিপাদকানি বাক্যানি তানি পুত্রিকাবিষয়াণি। ঐ পৃ ৪৫৬

আবার অনেকে মনে করেন, স্ত্রীগণের দায়সম্বন্ধ নাই—

অন্যে তু স্ত্রীণাং ন দায়সম্বন্ধঃ। ঐ

কারণ শ্রুতিতে আছে—

তস্মাৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ। ঐ

এই বাক্যটি আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রের।

এইখানে বরদরাজ স্মৃতি ও পুরাণ হইতে বিস্তর প্রতিকূল বচন একত্র করিয়া দেখাইয়াছেন যাহাতে নারীদের উত্তরাধিকার নাই। কোনো কোনো পুরাণ-বাক্যে আছে, স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবাকে খোরাক-পোশাক মাত্র দিতে হইবে, তাহাও দিবে হিসাব করিয়া—

বসনাশনবাসাংসি বিগণয্য ধবে মৃতে। ঐ

কোনো কোনো স্মৃতিতে আছে, সবদ্রব্যই যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, সেখানে নারীর অধিকার নাই, তাই তাহাদের উত্তরাধিকার নাই। মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন তাহারা পাইতে পারে—

যজ্ঞার্থং দ্রব্যমুৎপন্নং তত্র নাধিকৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অরিক্থভাজস্তাঃ সর্বাঃ গ্রাসাচ্ছাধনভাজনাঃ। ঐ

বৃহস্পতি বলেন, যৌবনে বিধবা হইলে নারী কর্কশা হইয়া যায়। তাই জীবন যাপন করিবার মত তাহাকে সামান্য কিছু খোরপোশ দিলেই চলে—

বিধবা যৌবনস্থা চেন্ নারী ভবতি কর্কশা।
আয়ুষঃ ক্ষপণার্থং তু দাতব্যং জীবনং তদা। পৃ ৪৫৭

মনুর মতে, অপুত্রা বিধবা সৎপথে থাকিলে ভরণপোষণমাত্র পাইতে পারে। প্রজাপতি বলেন, বিধবার খোরাকী বলিয়া আঢ়ক-প্রমাণ শস্য দিবে—

আঢ়কং ভর্তৃহীনায়া দাতব্যং বিধবাশনম্। ঐ

অপরাহ্নে ইন্ধন ও একপ্রস্থ চাউল তাহাকে দিবে—

অন্নার্থং তণ্ডুলপ্রস্থমপরাহ্নে তু সেন্ধনম্। ঐ

বরদরাজ বলেন, এইসব কথায় বুঝা যায়, ব্যবস্থাপকদের মতে বিধবা জ্ঞাতিদের কাছে খোরাকি মাত্র পাইবেন। দায়াধিকার বিধবার নাই, কিন্তু সেইসব কথায় কোনো যুক্তি নাই।

বিষ্ণুর মতকে প্রমাণ করিয়া বরদরাজ বলেন, পুত্রহীন পরলোকগতের ধন পত্নীতেই যাইবে, পত্নী না থাকিলে দুহিতা, দুহিতার অভাবে পিতা অধিকারী—

অনপত্যস্য প্রমীতস্য ধনং পত্ন্যভিগামি। তদভাবে দুহিতৃগামি। তদভাবে পিতৃগামি। তদভাবে মাতৃগামি। ইত্যাদি পৃ ৪৪৮

বৃহস্পতি বলেন, ভার্যাসুতবিহীন পরলোকগতের ধনাধিকারিণী মাতা বা তদাজ্ঞায় ভ্রাতা—

ভার্যাসুতবিহীনস্য পুত্রবস্য মৃতস্য চ।
মাতা রিক্থহরা জ্ঞেয়া ভ্রাতা বা তদনুজ্ঞয়া। ঐ

বৃদ্ধমনু বলেন, অপুত্রা সাধ্বী পত্নী স্বামীর পিণ্ডদানের ও সম্পূর্ণ অংশের অধিকারিণী—

পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎপিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভেত চ। ঐ

প্রজাপতিকে উদ্ধৃত করিয়া বরদরাজ বলেন, ভার্যা অর্ধাঙ্গিনী, পুণ্যাপুণ্য-ফলভাগিনী, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে স্বামীর ধন কেন অন্যে পাইবে?—

আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ।
শরীরার্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।
যস্য নোপরতা ভার্যা দেহার্ধং তস্য জীবতি।
জীবত্যর্ধশরীরেঽর্থং কথমন্যঃ সমাপ্নুয়াৎ।[৬১] পৃ ৪৪৯

শ্রুতির মতেও স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে এক পূর্ণ স্বরূপেরই দুই অংশ। স্ত্রী যদি স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হন তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর মধ্যে তিনিই বর্তিয়া থাকেন (continues to exist), কাজেই তখনও উত্তরাধিকারের প্রশ্নই উঠে না।

৬১ এখানে বরদরাজ একটি চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেন। শ্রুতি অনুসারে স্বামী ও স্ত্রী দুইই এক। এক সত্তারই দুই অর্ধভাগ। কাজেই স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীতে স্বামী অনুবর্তন করেন (continues to exist)। তাই স্বামীর অভাবে স্ত্রীর যে অধিকার তাহাকে 'উত্তরা'ধিকার বলা উচিত নহে। স্ত্রীর মধ্যে যে স্বামী তখনও বর্তিয়া আছেন। এ যেন ব্যাঙ্কের Payable to either or surivor। অর্থাৎ এখানে উভয়ের যুক্তাধিকার। এক জনের অভাবেও অন্যজনে সেই অধিকারই চলিতে থাকিবে। কাজেই ইহা উত্তরাধিকার নহে। ইহাতে অধিকারের অনুবৃত্তি (continuation) মাত্র বুঝায়। শ্রুতির দোহাই দিয়াই এই বিচারের আরম্ভ।

কারণ তখনও অধিকারীর আর-এক অংশ বাঁচিয়া-বর্তিয়াই আছেন। সুতরাং তখন ধন-"অধিকারী" বলিয়া সেই অর্ধাঙ্গেরই প্রাপ্য, "উত্তরাধিকারী" বলিয়া নহে। পত্নী না থাকিলে তখন সন্তানদের উত্তরাধিকারের কথা। সেখানেও পুত্র অপেক্ষা কন্যার দাবি কেন কম হইবে?

বৃহস্পতিও বলেন, পত্নী স্বামীর ধনহারিণী, পত্নীর অভাবে দুহিতা—

ভর্তুর্ধনহরী পত্নী তাং বিনা দুহিতা স্মৃতা। ঐ

পিতামহও বলেন, অপুত্র স্বামীর পত্নীই স্বামীর ভাগহারিণী—

অপুত্রস্য প্রমীতস্য পত্নী তদ্‌ভাগহারিণী। ঐ

কাত্যায়নের মতেও অব্যভিচারিণী পত্নী স্বামীর ধনহারিণী, তদভাবে তাঁহার কন্যা যদি সে তখনও অনূঢ়া থাকে—

পত্নী ভর্তুর্ধনহরী যা স্যাদব্যভিচারিণী।
তদভাবে তু দুহিতা যদ্যনূঢ়া ভবেৎ তদা। পৃ ৪৫০

দেবল বলেন, পিতৃদ্রব্য ও বৈবাহিক ধন কন্যাদের দিতে হইবে। অপুত্রদের ধর্মজা কন্যা পুত্রবৎ পিতৃধনের অধিকারিণী—

কন্যাভ্যশ্চ পিতৃদ্রব্যং দেয়ং বৈবাহিকং বসু।
অপুত্রকস্য স্বং কন্যা ধর্মজা পুত্রবদ্ধরেৎ। পৃ ৪৫১

মনু-নারদ উভয়েই বলেন, পুত্র যেমন আত্মসম, দুহিতাও তেমনি পুত্রসমা, কাজেই আপনার ও পুত্রকন্যার মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। সেই আপনি বাঁচিয়া থাকিতে, অর্থাৎ পুত্রকন্যা থাকিতে, কেন অন্যে ধন হরণ করিবে?—

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ। ঐ

প্রসঙ্গবশে এই শ্লোকটির উল্লেখ পূর্বেও করা হইয়াছে।

মনুও (৯.১৩০) বলেন—

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।

নারদও বলেন, পুত্রকন্যা উভয়ই সমান। কাজেই পুত্রাভাবে দুহিতাই পুত্র। পুত্রকন্যা উভয়ই পিতার বংশ রক্ষা করে—

পুত্রাভাবে তু দুহিতা তুল্যসন্তানদর্শনাৎ।
পুত্রশ্চ দুহিতা চোভৌ পিতুঃ সন্তানকারকৌ। ঐ

বৃহস্পতি বলেন, পত্নী স্বামীর ধনহারিণী, পত্নী না থাকিলে দুহিতাই

শাস্ত্রবিহিত উত্তরাধিকারিণী। অঙ্গ-অঙ্গ হইতে সম্ভূতা কন্যা তো মানুষের পক্ষে পুত্রেরই সমান। তাহার পিতৃধন কেন অন্যলোক হরণ করিবে?—

ভর্তুর্ধনহরী পত্নী তাং বিনা দুহিতা স্মৃতা।
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্ দুহিতা নৃণাম্।
তস্যাঃ পিতৃধনং ত্বন্যঃ কথং গৃহ্লীত মানবঃ। পৃ ৪৫১-৪৫২

দুহিতা না থাকিলে দৌহিত্রেরা পাইবেন ইহাই বরদরাজের মত—

দুহিত্রভাবে দৌহিত্রাঃ গৃহ্নীয়ুঃ। ঐ

পুত্র উপার্জন করিতে পারেন। পিতৃধন না পাইলেও তাঁহার চলে। কন্যার উপার্জনক্ষমতা বা ধন যদি না থাকে তবে পিতৃধন না পাইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহার দাবি বরং বেশি। পতির জীবৎকালে স্ত্রীর অঙ্গে যে অলংকার থাকে তাহাতে পতিকুলস্থ লোকের কোনো দাবি নাই। দাবি করিলে তাঁহারা পতিত হন। মনুর এই মত বরদরাজ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদাঃ ভজমানাঃ পতন্তি তে। পৃ ৪৬৮

ইহাতে কাত্যায়নের যে সমর্থন তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে—

স্ত্রীণাং ভর্তৃকুলাল্লব্ধং পিতুঃ কুলত এব বা।
ভূষণং ন বিভাজ্যং স্যাৎ জীবনে ন চ যোজয়েৎ। ঐ

পতির বা পিতার কুলের কাছে প্রাপ্ত সব অলংকারই স্ত্রীর নিজস্ব। জ্ঞাতিগণ তাহার দ্বারা সেই নারীর খোরপোশের দাবি মিটাইতে পারিবেন না।

আপস্তম্ব যদিও বলিয়াছেন, কেহ কেহ কিন্তু ভার্যার অলংকারকেও জ্ঞাতিধন বলেন—

অলঙ্কারো ভার্য্যায়া জ্ঞাতিধনং চেত্যেকে। পৃ ৪৬৯

এইখানে বরদরাজ নারদের মতের দ্বারা এই বৃথা দাবি নিরস্ত করিয়াছেন। নারদ বলেন, স্বামীর দ্বারা প্রীতিদত্ত অলংকার স্বামীর মৃত্যুর পরেও সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর। তাহারই ভোগ-ত্যাগের দানবিক্রয়ের পূর্ণাধিকার। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীর দানবিক্রয়ের অধিকার নাই—

প্রীতিদত্তালংকারস্য স্বত্বে প্রাপ্তে স্থাবরেঽপবাদমাহ নারদঃ
ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেঽপি তৎ।
সা যথাকামমশ্নীয়াৎ দদ্যাদ্ বা স্থাবরাদৃতে। ঐ

কাজেই স্থাবর সম্পত্তিতে নারদের মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বত্ব হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেক শাস্ত্রকারের মতে প্রীতিদত্ত স্থাবরেও স্ত্রীরই স্বত্ব হয়—

প্রীতিদত্তং স্থাবরং দাতরি মৃতে স্ত্রিয়াঃ ন স্বং ভবতি ইত্যর্থঃ।
কেচিৎ তু প্রীতিদত্তং স্থাবরমপি স্বমেব। ঐ

এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বিশেষ বিধি বরদরাজ উদ্ধৃত করিয়াছেন—দুর্ভিক্ষে, ধর্মকার্যে, ব্যাধিতে, রাজার হাতে বন্দী হইলে যদি স্বামী স্ত্রীধন হইতে কিছু নেন তবে তাঁহাকে বাধ্য করিয়া তাহা আদায় করা অনুচিত—

দুর্ভিক্ষে ধর্মকার্যে চ ব্যাধৌ সংপ্রতিরোধকে।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্রা নাকামো দাতুমর্হতি। ঐ

এইখানে কাত্যায়ন বলেন, স্ত্রীধনে স্বামী-পুত্র পিতা-ভ্রাতা কাহারই কোনো অধিকার নাই। যদি ইহাদের মধ্যে কেহ বলপূর্বক তাহা ভোগ করেন তবে তিনি দণ্ডনীয় এবং সুদসহ তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য—

নৈব ভর্তা নৈব সুতো ন পিতা ভ্রাতরো ন চ।
আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥
যদি হ্যন্যতরো হেষাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্ বলাৎ।
সবৃদ্ধিকং প্রদাপ্যঃ স্যাৎ দণ্ডং চৈব সমাপ্নুয়াৎ। ঐ

তবে কাত্যায়ন বলেন, যদি ইহাদের কেহ ঠেকায় পড়িয়া স্বত্বাধিকারিণীর আজ্ঞানুসারে কিছু ভোগ করেন তবে সমর্থ হইলেই সেই মূল্যধন তিনি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। ব্যাধিত ব্যসনার্ত বা ঋণের দায় দেখিয়া যদি স্বত্বাধিকারিণী আপন খুশিতে তাহাকে কিছু সাহায্য করিয়াও থাকেন তবে পরে সেই স্ত্রীধন আপন ইচ্ছায় তাঁহারই ফিরাইয়া দেওয়া উচিত—

তদেব যদনুজ্ঞাপ্য ভক্ষয়েৎ প্রীতিপূর্বকম্।
মূল্যমেব স দাপ্যঃ স্যাৎ যদাসৌ ধনবান্ ভবেৎ।
ব্যাধিতং ব্যসনার্তং চ ধনিকৈর্বোপপীড়িতম্।
জ্ঞাত্বা নিসৃষ্টং যৎপ্রীত্যা দদ্যাদাত্মেচ্ছয়া তু সঃ। পৃ ৪৭০

দেবল বলেন, বৃত্তি আভরণ শুল্কলাভ সব সমেতই স্ত্রীধন। স্ত্রীই তাহা ভোগ করিবেন। বিপদগ্রস্ত না হইলে পতির তাহাতে কোনো দাবি নাই। যদি বিনা কারণে পতি তাহা ভোগ করেন তবে স্ত্রীকে সুদ সমেত ফিরাইয়া দিতে তিনি বাধ্য। পুত্রের পীড়ার প্রতিকারেও স্ত্রীধন লওয়া যাইতে পারে—

বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভং চ স্ত্রীধনং ভবেৎ।
ভোক্ত্রী তৎস্বয়মেবেদং পতির্নার্হত্যনাপদি।
বৃথা মোক্ষে চ ভোগে চ স্ত্রিয়ৈ দদ্যাৎ সবৃদ্ধিকম্।
পুত্রার্তিহরণে চাপি স্ত্রীধনং ভোক্তুমর্হতি। ঐ

এই বিষয়ে ইহার পরেও বরদরাজ (পৃ ৪৭০-৪৭১) নানাশাস্ত্রকারের মতামত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীধনের বিষয়ে নানাদিক দিয়া বিচার করিয়াছেন।

স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি নারীদের অধিকার বিষয়ে বরদরাজ অতিশয় স্পষ্টভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, পুত্র-পত্নী-কন্যাদের অসদ্ভাবেই আত্মীয়েরা ধন পাইতে পারেন, ইহাই শাস্ত্রকারগণের অনেকের মত—

যদিদং সংসৃষ্টিনো ধনগ্রহণমুক্তং তৎপুত্রপত্নীদুহিতৄণামভাবে ইতি কেচিৎ। পৃ ৪৭৬

বৃহস্পতির মতে, কেহ মারা গেলে বা প্রব্রজ্যা লইলে সে যদি অপুত্র ও অপত্নীক হয় তবেও তাহার ভাগ লুপ্ত হইবে না। সোদর ভাই তাহার ভাগ পাইবেন, ভগিনীও পাইবেন—

যা তস্য ভগিনী সা তু ততোঽংশং লব্ধুমর্হতি। ঐ

নারদবচনেও ইহা সমর্থিত (পৃ ৪৭৭)। বরদরাজ প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতামত আলোচনা করিয়া বলেন, ভার্যা না থাকিলেই আত্মীয়েরা ধনাধিকারী হইতে পারেন—

ভার্যাঽসম্ভাব এব সংসৃষ্টিনো ধনগ্রহণমিতি গম্যতে। ঐ

যেসব স্মৃতিকার 'যোষিৎ, বিধবা, নারী, স্ত্রী, ভার্যা' প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা স্ত্রীর জন্য ভরণপোষণমাত্র ব্যবস্থা করেন। আর যে-সব স্মৃতিতে 'পত্নী' শব্দের প্রয়োগ, তাঁহারা সম্পূর্ণ দায়াধিকার পত্নীকেই দেন। ইহাই বৃদ্ধদের মত—

ইতি নারদবচনাৎ ভার্যাসম্ভাব এব সংসৃষ্টিনো ধনগ্রহণমিতি গম্যতে।
সত্যম্, পত্নী দায়াযোগ্যা স্ত্রীষু নারদবচনমিত্যবিরোধঃ।
যাসু স্মৃতিষু যোষিদ্বিধবানারীস্ত্রীভার্যেত্যাদি শব্দপ্রয়োগঃ, তাসু তাসাং ভরণমেব।
যাসু স্মৃতিষু পত্নীশব্দপ্রয়োগঃ তাসু দায়গ্রহণমিতি বৃদ্ধাঃ। ঐ

অর্থাৎ তখনকার দিনেও বৃদ্ধ শাস্ত্রকারদের জানা ছিল, একদল স্ত্রীর দায়াধিকার ভালো করিয়া না মানিলেও আর-একদল তাহা মানেন। যাঁহারা স্ত্রীদের

অধিকার মানেন না, তাঁহারা স্ত্রীকে বুঝাইতে 'যোষিৎ' 'বিধবা' 'নারী' 'ভার্যা' প্রভৃতি হীনতাবাচক শব্দ ব্যবহার করেন। আর যাঁহারা অধিকার মানেন তাহারা শ্রেষ্ঠত্ববাচক 'পত্নী' শব্দ ব্যবহার করেন। বরদরাজ শেষোক্ত দলেরই মত সমর্থন করেন। তাঁহার মতে স্ত্রী সম্মানার্হা, 'পত্নী'-পদবাচ্যা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতি প্রভৃতি যেসব শাস্ত্রকারেরা জ্ঞাতিদের কাছে বিধবার খোরপোশের ব্যবস্থামাত্র মানেন, দায়াধিকার মানেন না, তাঁহাদের সঙ্গে বরদরাজ একমত নহেন। তাঁহারা বলেন, জ্ঞাতিরাই দায়াধিকারী। বরদরাজ অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এইসব কথা অতিশয় অন্যায় ও একেবারে যুক্তিহীন—

অপুত্রারা বিধবায়া জ্ঞাতিভরণমাত্রমেব ন দায়প্রাপ্তিঃ।
দায়প্রাপ্তিস্তু জ্ঞাতীনামেব মন্যন্তে। এতৎ সর্বমযুক্তম্। পৃ ৪৫৭

মনু যে বলেন—

পিতা হরেদপুত্রস্য রিক্থং ভ্রাতর এব বা। পৃ ৪৫৮

ইহাতে বরদরাজ বলেন, এখানে 'এব' শব্দের দ্বারা পিতা হইতে ভ্রাতার প্রাথম্য বুঝায় মাত্র, স্ত্রীর স্বত্ব নাই এইরূপ বুঝায় না, কারণ ইহাতে ক্রম-প্রতিপাদক শব্দের অভাব রহিয়াছে—

ক্রমপ্রতিপাদকশব্দাভাবান্ ন প্রথমং পত্নীব্যুদাসঃ।
এবকারাৎ পিত্রপেক্ষয়া ভ্রাতুঃ প্রাথম্যম্। পৃ ৪৫৮

তথা

অনপত্যস্য পুত্রস্য মাতা দায়মবাপ্নুয়াৎ। ঐ

এই মনুবচনেও ক্রমপরশব্দাভাববশতঃ পত্নীর দাবি অস্বীকৃত হইল না—

ইতি মনুবচনেঽপি ক্রমপরশব্দাভাবান্ ন পত্ন্যা ব্যুদাসঃ। পৃ ৪৫৮

বরদরাজ বলেন, শঙ্খ-লিখিতোক্ত এবং দেবলবচনে যদিও সোদর ভ্রাতাদেরই প্রথম ধনগ্রহণ বুঝা যায় তবু, নানা শাস্ত্রকারদের বচন-আলোচনে বুঝা যায়, সাধ্বাচারা পত্নীর সকলধনগ্রহণই প্রথম। বহু-বহু বচনের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। সেইসব বচনের সঙ্গে সংগত করিয়াই শঙ্খ-লিখিতোক্ত এবং দেবলোক্ত বচনের ব্যাখ্যান করা উচিত—

শঙ্খলিখিতদেবলবচনয়োঃ যদ্যপি সোদরভ্রাতৄণাং প্রথমং ধনগ্রহণং প্রতীয়তে, তথাপি সাধ্বাচারায়াঃ পত্ন্যাঃ সকলধনগ্রহণং প্রথমং বহুভিঃ বচনৈঃ প্রতীয়ত ইতি, তেষামানুগুণ্যেন তয়োর্বচনয়োঃ ব্যাখ্যানং কর্তব্যম্। পৃ ৪৫৮-৪৫৯[৬২]

সর্বমতেই প্রমাণিত হয়, সাধ্বী পত্নী স্বামীর সকল ধন পাইতে পারেন। শঙ্খ-লিখিত ও দেবলের বচন ইহার সহিত সুসংগত করিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাই বরদারাজের সিদ্ধান্ত।

তবে এখন বিচার করিতে হইবে শ্রুতির বচনে ইহাতে কোনো বাধা আছে কি না। পূর্বে যে শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

তস্মাৎ স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ। পৃ ৪৫৬

তাহার কি করা যায়? ইহাতে যদি নারীদের উত্তরাধিকার নিষিদ্ধই হইয়া থাকে তবে পূর্বোক্ত সব ব্যবস্থাপক মুনিগণ কখনো তাঁহাদের গ্রন্থে নারীদের উত্তরাধিকারব্যবস্থা দিতে পারিতেন না। তবে আপস্তম্বধর্মসূত্রোক্ত বচনটির যথার্থ তাৎপর্য কি? এই বচনে দেখা যায়, তাই নারীরা 'নিরিন্দ্রিয়া আদায়াদীঃ'। এখন 'নিরিন্দ্রিয়' কথার প্রকৃত অর্থ কি?

এখানে ইন্দ্রিয় শব্দে বীর্য বুঝায় না, কারণ শাস্ত্রে নারীদের বীর্যবত্ত্ব দেখা যায়। তাই সেইভাবে স্ত্রীগণকে নিরিন্দ্রিয় বলা যায় না। ইহাতে বুঝা যায় এখানে 'ইন্দ্রিয়' শব্দে সোমই বুঝাইতেছে—

৬২ এই তর্কের মাঝখানে বরদারাজ অনেক শাস্ত্রকারদের মতের যে নিষ্কর্ষ দিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যাউক—

অনপত্যস্য প্রমীতস্য ধনং পত্ন্যভিগামি (অর্থাৎ অপুত্র মৃতের ধন পত্নীতে যাইবে)। ইতি বৈকবচনাৎ।

'ভার্যাসুতবিহীনস্য'—ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ,
"অপুত্রা শয়নং ভর্তুঃ'—ইতি বৃদ্ধমনুবচনাৎ,
'আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ'—ইতি প্রাজাপত্যবচনাৎ,
'ভর্তুর্ধনহরী পত্নী'—ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ,
'অপুত্রস্যাথ কুলজা'—ইতি কাত্যায়নবচনাৎ,
'কুল্যেষু বিদ্যমানেষু'—ইতি পিতামহবচনাৎ,
'অসুতস্য প্রমীতস্য'—ইতি বৃহস্পতিবচনাৎ,
পত্নী দুহিতরশ্চ'—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ। পৃ ৪৫৮

স্ত্রীণামপি বীর্যবত্ত্বদর্শনাৎ। তস্মাৎ স্ত্রিয়ো 'নিরিন্দ্রিয়া' ইতি বক্তুং ন শক্যত ইতি
: সোমপর এব যুক্তঃ'। পৃ ৪৫৯

কাজেই নির্বীর্য বলিয়াই স্ত্রীগণের দায়াধিকার নাই ইহা বলা অসংগত। বীর্য না থাকিলে তখনকার দিনে ভূসম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হইত না, ইহা ঠিক। কিন্তু এই মত যদি এখনো চালানো যায় তবে আমাদের দেশে এখন পুরুষদেরও অধিকার নিষিদ্ধ হয়। কারণ এখন আর এ দেশে পুরুষদেরই বা বীর্য কই?

তবে আসল কথা, নিরিন্দ্রিয় অর্থে নির্বীর্য নহে। বরদরাজ 'ইন্দ্রিয়ে'র অর্থ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে তাহাতে 'সোমপীথঃ' বা সোমপান বুঝায়—

'ইন্দ্রিয়ং বৈ সোমপীথঃ' ইতি ইন্দ্রিয়শব্দস্য সোমে দর্শনাৎ। পৃ ৪৫৯

সোমপানের অধিকারও যজ্ঞবিশেষেই নারীর নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে পূর্বে দেখানো গিয়াছে এককালে নারীরা সোমপানেরও অধিকারী ছিলেন।

রামায়ণে দেখা যায়, কৌশল্যা ছিলেন দশরথের যজ্ঞাংশভাগিনী। কুন্তী বলেন, আমি বিধি অনুসারে সোমপান করিয়াছি—

পীতঃ সোমো যথাবিধি। মহাভারত, আশ্রমিক ১৭. ১৭

যাহা হউক, যজ্ঞবিশেষে সোমপানাধিকার না থাকিলেই যে স্বামীর ধনে অধিকার থাকিবে না ইহা কোনো যুক্তিযুক্ত কথা নহে।

ইন্দ্রিয় অর্থে বরদরাজ কেন যে সোম ধরিয়াছেন তাহার প্রমাণও তিনি দিয়াছেন। সোমার্থে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার আমরাও বহুস্থলে পাই। ঋগ্বেদে প্রথমমণ্ডলে ৮৪ সূক্তের প্রথম ঋকে 'ইন্দ্রিয়ম্' অর্থে সায়ণ 'সোমপানোৎপন্নম্ প্রভূতম্ সামর্থ্যম্' ধরিয়াছেন। সায়ণ-মতে, ঋগ্বেদে ১. ১১১ দ্বিতীয়মন্ত্রে এবং ১. ১০৭. ২ ; ৫. ৩১. ৩ ; ৬. ২৫. ৮ ঋকে 'ইন্দ্রিয়' অর্থ ধন ঐশ্বর্য। ঋগ্বেদে ৮. ৯৩. ২৭ ঋকে ইন্দ্রিয় অর্থ সায়ণ করেন 'বীর্যবন্তং সোমম্'— অর্থ ধন ঐশ্বর্য। ঋগ্বেদে ৯. ২৩. ৫ ঋকে 'ইন্দ্রিয়' অর্থ ইন্দ্রিয়বর্দ্ধক রস (ইন্দ্রিয়-বর্দ্ধকং রসম্) অর্থাৎ সোমরস। ১০. ৩৬. অষ্টম ঋকে, মূলেই আছে, 'সুরশ্মিং সোমম্ ইন্দ্রিয়ং বীর্যং যমীমহি'। ১০. ১১৩ প্রথম ঋকে, মূলেই আছে 'ইন্দ্রিয়ং পীত্বী সোমস্য'। ৮. ৩. ২০ ঋকে 'সোম ইন্দ্রিয়ো রসঃ'—সায়ণ অর্থ করেন 'ইন্দ্রিয়', 'ইন্দ্রেণ সেব্যো রসঃ'। ৯. ৮৬. ১০ ঋকে 'ইন্দ্রিয়ো রসঃ' অর্থে সায়ণ করেন, 'ইন্দ্রেণ জুষ্ট ইন্দ্রস্য বর্ধকো বা রসঃ'। ৮. ৯৩. ২৭ ঋকে ইন্দ্রিয় অর্থে সায়ণ বলেন 'বীর্যবন্তং সোমম্' ১০. ৬৫. ১০ ঋকে 'ইন্দ্রিয়ং সোমম্' মূলেই আছে।

সায়ণ অর্থ করেন, ইন্দ্রিয়ং 'ইন্দ্রজুষ্টম্ সোমম্'। ঋগ্বেদে ৯. ১০৭. ২৫ ; ৯. ১১৩. ১ ঋকেও তাই। অথর্ববেদে ১৯. ২৭. ১ ঋকে ইন্দ্রিয় অর্থ সায়ণ করেন ইন্দ্রসৃষ্ট বা 'ইন্দ্রজুষ্ট'। *St. Petersburg* অভিধানও ইন্দ্রিয় অর্থে প্রথমেই রস ও সোম ধরিয়াছেন। তাহার পরে আসিতেছে অন্য সব অর্থ।

'ইন্দ্রিয়'শব্দের আসল এবং আদি অর্থই হইল যাহা 'ইন্দ্রযোগ্য', 'ইন্দ্রজুষ্ট' 'ইন্দ্রবিষয়ক'। সোমরসই ইন্দ্রের প্রিয়। শক্তি ও বীর্যও ইন্দ্রের প্রিয়। আমাদের তথাকথিত ইন্দ্রিয়গুলিই সেই শক্তি ও বীর্যপ্রকাশের উপায়। সেই হিসাবে বরদরাজ 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ করিতে কষ্টকল্পনামাত্র করেন নাই। তাঁহার গৃহীত অর্থই আদিম অর্থ এবং তাহা সর্বভাবেই শ্রুতিসংগত। তাহা না হইলে তাঁহার মত লোক এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতেন না।

তবু যে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ স্থলে দায়াধিকারে নারীদের অধিকার নাই, এই কথা বলা হইয়াছে, সেখানেও বিশেষ বিশেষ কারণবশত সেই সেই স্থলে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে— ইহাই বুঝিতে হইবে (পৃ ৪৫৯)। তাই বরদরাজের চরম সিদ্ধান্ত হইল, সুশীলা পত্নীর সর্বধনগ্রহণ যুক্তিযুক্ত—

সাধুবৃত্তযুক্তায়াঃ পত্ন্যাঃ সকলগ্রহণং যুক্তমেব। পৃ ৪৬১

এই কথাটি আরও স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে ঐ গ্রন্থের শেষে স্বতন্ত্র আর-একটি অনুবন্ধে (পৃ ৫৩৭)। সেখানে বরদারাজ-উক্ত শাস্ত্রসিদ্ধ রীতিতে রিকৃথগ্রাহীদের অর্থাৎ দায়াধিকারীদের প্রাধান্য অনুসারে পর-পর ক্রম দেখানো হইয়াছে : ১ ঔরসাদিপুত্র, ২ পত্নী, ৩ দুহিতা, ৪ অনূঢ়া কন্যা, ৫ দৌহিত্র, ৬ মাতা, ৭ পিতা, ৮ সহোদর, ৯ তৎপুত্র, ১০ ভিন্নোদর ভ্রাতা, ১১ তৎপুত্র, ১২ সমানোদক জ্ঞাতি, ১৩ সগোত্র, ১৪ আত্মবান্ধব, ১৫ পিতৃবান্ধব, ১৬ মাতৃবান্ধব, ১৭ শিষ্য, ১৮ সব্রহ্মচারী, ১৯ শ্রোত্রিয়।

ব্যবহারনির্ণয়ে (পৃ ৪৫০) যাজ্ঞবল্ক্য রিকৃথগ্রাহীদের আর-একটি ক্রম দিয়াছেন। সেখানেও দেখা যায়—'পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরো ভ্রাতরস্তথা' ইত্যাদি।

সর্ব ভাবেই দেখা গেল, ঔরসপুত্র না থাকিলে প্রথম দাবিই হইল পত্নীর। আর পত্নী স্বামীরই অংশ বলিয়া তাঁহার দাবিকে 'উত্তরা'ধিকার না বলিয়া স্বামীর অধিকারেরই অনুবৃত্তি (বা continuity) বলা যায়। পতির বিত্তে পত্নীর 'উত্তর'-অধিকারের প্রশ্নই ওঠে না।

সংশোধন

পৃ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৬	জ্যোবিরগ্রা	জ্যোতিরগ্রা
৬	২১	-বৈশ্যের	-বৈশ্যের অধিকার
৮	১৯	বসুক্রজায়া	বসুক্রজায়া
১০	৪	মাদন্তে	মাদন্তে
১২	২০	পদ্মাবত	পদ্মাবতী
১৩	১৩	কুচ্ছ্র	কৃচ্ছ্র
	২১	জাতিক্রিয়াদি	জাতক্রিয়াদি
১৮	১৫	মমেষা	মম্মৈষা
২০	২	ধমঃ	ধর্মঃ
২১	৩০	তপসেবৃতা	তপসে ধৃতা
২৩	৩	জগত্যাচ্ছন্নাবিগ্রহা	জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা
২৫	১৬	শতকৈঃ	শনকৈঃ
	২৩	শচ্ ক্র্ শুশ্চ	শচ্ক্রুশুশ্চ
২৬	১৪	শঙ্করাচার্য	সায়ণাচার্য
	১৫	খলনের	ক্ষালনের
৩৩	২৪	কপিস্থল	কপিষ্ঠল
		তৈত্তিরীয়-ব্র	তৈত্তিরীয়-ব্রা

পৃ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	২৬	পরদারেষুঃপাদিতঃ	পরদারেষুৎপাদিতঃ
৩৫	৬	অহং নের্ষ্যামি	অহমীর্ষ্যামি
	৯	সদমে	সদনে
৩৯	১০	মনৈর্বৈ	মনোর্বৈ
৪১	৪	মেহভিধেহীতিতং	মেহভিধেহীতি তং
	৫	জহ্যমৃয়	জহ্যমুষ্য
	২৫	বৌধায়ণ-স্মৃতি	বৌধায়ন-স্মৃতি
৪৬	১	ইহাকে	ইহাতে
৮৬	১০	দিক্ষা	দীক্ষা
৯২	২৪	অম্মন্ তং	অস্মংতং
	২৬	উপস্থিততরম্ বদন্তি	উপস্থিততরমং
৯৫	৩	দৃষ্টিতে	দৃষ্টিতে।
৯৬	২৬	বিষ্ণুশ্রুতি	বিষ্ণুস্মৃতি
১০৩ ও অন্যত্র		বরদারাজ	বরদরাজ
১০৯	২৭	নয়।	হয়।
১২৬	১	তশ্মাৎ	তস্মাৎ
১২৭	১৫	সকলগ্রহণং	সকলধনগ্রহণং